গণদাবী

সোস্যালিস্ট ইউনিটি সেন্টার অফ ইন্ডিয়া (কমিউনিস্ট)-এর বাংলা মুখপত্র (সাপ্তাহিক)

৭৭ বর্ষ ২৯ সংখ্যা | ২৮ ফেব্রুয়ারি - ৬ মার্চ ২০২৫ | Web: https://ganadabi.com | আট পাতা | মূল্য ঃ ৩ টাকা | পৃ. ১

মহান স্ট্যালিন স্মরণে

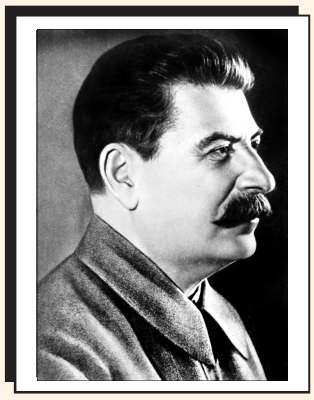

১৮ ডিসেম্বর ১৮৭৮ - ৫ মার্চ ১৯৫৩

“পার্টির কর্মসূচি, রণকৌশল এবং সাংগঠনিক অভিমতগুলি নিছক মৌখিকভাবে গ্রহণ করাই কি একজন পার্টি সদস্যের ক্ষেত্রে যথেষ্ট? এ রকম একজন ব্যক্তিকে কি সর্বহারার সেনাবাহিনীর যথার্থ নেতা বলা যায়? অবশ্যই নয়। এ রকম বুলি আওড়ানো বহু ব্যক্তি পাওয়া যাবে, যারা অনায়াসেই মুখে পার্টি কর্মসূচির সাথে একমত হয়ে তা গ্রহণ করে নেবে, কিন্তু কাজে কিছু করবে না। আমাদের পার্টি যে হেতু একটি সংগ্রামী পার্টি, তাই একজন পার্টির কর্মসূচি, কৌশলগত লাইন ও সাংগঠনিক অভিমতগুলিকে নিছক মৌখিকভাবে গ্রহণ করছে, কেবল এর দ্বারাই পার্টি কখনও সন্তুষ্ট হতে পারে না। পার্টির যে সদস্যরা একে গ্রহণ করবে, তারা অবশ্যই তা কার্যক্ষেত্রে রূপায়ণ করবে— এটা পার্টি দাবি করবেই।”

— জে ভি স্ট্যালিন

(সর্বহারা শ্রেণি ও সর্বহারার দল)

এক দেশ এক ভোট ঃ কেন্দ্রের হাতেই সব ক্ষমতা নিতে চায় বিজেপি পৃষ্ঠা ঃ ৩

মোদির কোনও আপত্তিই শুনবেন না বলে দিলেন ‘বন্ধু’ ট্রাম্প

মোদি-ট্রাম্প বৈঠক

বিজেপি-আরএসএস বাহিনী এবং অনুগত প্রচারমাধ্যম প্রচার করে করে দেশজুড়ে একটা হাওয়া তোলার চেষ্টা করে এসেছে যেন মোদির নেতৃত্বে ভারত আমেরিকার মতো শক্তিশালী রাষ্ট্রের সঙ্গেও কূটনৈতিক সম্পর্ক কিংবা বাণিজ্যিক লেনদেন, সব ক্ষেত্রেই ভারত আমেরিকার সঙ্গে সমানে সমানে লড়তে পারে এবং মোদি তাঁর গুণের প্রভাবে মার্কিন প্রেসিডেন্টদের ব্যক্তিগত বন্ধু করে ফেলেছেন। ভারত-আমেরিকার সদ্য বৈঠক সেই ফানুসকে একেবারে ফুটো করে দিয়েছে।

এই বৈঠক দেখাল যে, ভারতের সঙ্গে আমেরিকার সম্পর্কটি বাস্তবে প্রবল ক্ষমতাশালী একটি রাষ্ট্রের সঙ্গে অপেক্ষাকৃত দুর্বল একটি রাষ্ট্রের ব্যবসায়িক সম্পর্ক যেমন হয় ঠিক তেমনই। মোদির সঙ্গে ট্রাম্পের সম্পর্কটিও মোটেও বন্ধুত্বের নয়, সবচেয়ে ক্ষমতাশালী এক রাষ্ট্রপ্রধানের সঙ্গে অনেক কম শক্তিধর এক রাষ্ট্রপ্রধানের যেমন সম্পর্ক হওয়ার কথা ঠিক তেমনই। দুই দেশের শিল্পপতি-ধনকুবের গোষ্ঠীর রাজনৈতিক ম্যানেজার হিসাবে উভয়েই চেষ্টা করেছেন নিজ দেশের সাম্রাজ্যবাদী পুঁজির স্বার্থ রক্ষার চেষ্টা করতে। বলা বাহুল্য, সেই চেষ্টায় ডাহা ফেল করেছেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র দামোদার দাস মোদি। মোদি নিজে এবং তাঁর অনুগামীরা যতই তাঁর ছাপান্ন ইঞ্চি ছাতি নিয়ে গর্ব করুন (যা কেউ মেপে দেখেছে বলে প্রমাণ নেই), ট্রাম্পের পাশে বসা অবস্থায় তার এক ইঞ্চিরও হদিশ পাওয়া যায়নি। তাঁকে পাশে বসিয়ে রেখেই ট্রাম্প যে ভাবে ভারতের উপর এক তরফা মার্কিন বাণিজ্য-স্বার্থ গছিয়ে গেলেন এবং কাঁচুমাচু মুখে নরেন্দ্র মোদি সেগুলি গিলে এলেন তাতে তাঁকে দেখে নিতান্তই এক অনুগত রাষ্ট্রপ্রধান ছাড়া আর কিছু মনে হল না। মনে পড়ে যায় ইতিহাস

সাতের পাতায় দেখুন

উত্তরপ্রদেশের প্রতাপগড়ে জনসভা

আকাশছোঁয়া মূল্যবৃদ্ধি, বেকারি, দুর্নীতি, মহিলাদের উপর ক্রমবর্ধমান আক্রমণ, সাম্প্রদায়িকতা ও অন্ধবিশ্বাসের প্রসার, ঢালাও বেসরকারিকরণ ইত্যাদির বিরুদ্ধে এবং জাতীয় শিক্ষানীতি-২০২০, বিদ্যুৎ আইন সংশোধনী বিল-২০২২, চারটি শ্রম কোড

পাঁচের পাতায় দেখুন

আর জি কর আন্দোলন যা দিল জনগণকে

দীর্ঘ ৬ মাস অতিক্রান্ত। আর জি কর হাসপাতালের চিকিৎসক-ছাত্রী-‘অভয়া’র খুন-ধর্ষণ মামলায় শিয়ালদা কোর্টের রায় মানুষকে হতাশ করেছে। মানুষ বেদনায়, ক্ষোভে প্রশ্ন করছে, কেন ন্যায়বিচার পেলাম না, মানুষ খুঁজছে ন্যায় বিচারের সামনে প্রতিবন্ধক কী ছিল? শুধুই কি একা সঞ্জয় রায় খুনি? কিন্তু এ কথা তো ভুললে চলবে না, জুনিয়র ডাক্তার, সিনিয়র ডাক্তার, নার্স সহ সমাজের সর্বস্তরের মানুষের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় এ ছিল এক ঐতিহাসিক আন্দোলন। স্বাধীনতার পরে ভারতে এই প্রথম কোনও রাজনৈতিক দলের ছত্রছায়ায় না থেকে জনগণ এইরকম স্বতঃস্ফূর্ত গণআন্দোলন সংগঠিত করল। ‘অভয়া’র আন্দোলন এই বার্তাও দিয়ে গেল যে কোনও রাজনৈতিক দলের থেকে দলমত নির্বিশেষে সচেতন ঐক্যবদ্ধ জনগণের শক্তি অনেক বেশি।

এই আন্দোলনের সাফল্যের দিকগুলো আমাদের স্মরণে রাখা দরকার। যেমন আন্দোলন না হলে মানুষ জানতেই পারত না, এটা একটা পরিকল্পিত হত্যাকাণ্ড, খুনটাই ছিল মূল উদ্দেশ্য। এখানে ধর্ষণের একটা গল্প সাজানোর চেষ্টা করা হয়েছিল। হয়তো ‘অভয়া’ আর জি করের প্রশাসনের এমন কিছু বিষয় জানতেন, যা প্রকাশিত হলে রাজ্যের সর্বোচ্চ প্রশাসন পর্যন্ত বিপাকে পড়ত। তাই তাকে সরিয়ে দাও পৃথিবী থেকে। অভয়া হত্যাকে আত্মহত্যা বলে চালানোর সর্বাত্মক চেষ্টা করল

চারের পাতায় দেখুন

কুম্ভের জল স্নানেরও অযোগ্য
জানালেন বিজ্ঞানীরা

কেন্দ্র ও রাজ্যের দুই বিজেপি সরকার এক সুরে সগর্বে ঘোষণা করেছিল, ১৪৪ বছরে মাত্র একবার যে সুযোগ মেলে সেই ‘অমৃতকুম্ভ’ তাঁরা দক্ষ হাতে উদযাপন করবেন। তাঁরা বলেছিলেন ৪০ কোটি মানুষ এইবারের মহাকুম্ভে স্নান করবেন। কিন্তু যত দিন যাচ্ছে, একের পর এক ঘটনা ও দুর্ঘটনায় দুই সরকারের চরম ব্যর্থতা প্রকট হচ্ছে। প্রথমে গত ২৯ জানুয়ারি মধ্যরাতে স্নান করতে গিয়ে পদপিষ্ট হয়ে সরকারি মতে অন্তত ৩০ জনের মৃত্যু ঘটে, আহত হন শতাধিক মানুষ। যদিও বাস্তবে দুটি সংখ্যাই অনেক বেশি। তারপর ১৫ ফেব্রুয়ারি কুম্ভের উদ্দেশ্যে যাত্রা করার পথে নয়াদিল্লি রেল স্টেশনে পদপিষ্ট হয়ে মারা যান ভারতীয় রেলের হিসাব অনুযায়ী অন্তত ১৮ জন, আহত হন বহু মানুষ। যদিও মৃত্যুর প্রকৃত সংখ্যাটা এ ক্ষেত্রেও অনেক বেশি। প্রতিদিনই মহাকুম্ভে আসা-যাওয়ার পথে ছোট-বড় নানা দুর্ঘটনায়, সরকারি তথ্য অনুযায়ী এখনও পর্যন্ত ১৩২ জনের প্রাণ গিয়েছে।

কেবল দুর্ঘটনাই নয়, যে মহাকুম্ভে স্নান করলে ‘অমৃত-লাভে’র কথা বলা হচ্ছে, তার জলও ভয়ঙ্কর দূষিত হয়ে পড়েছে। কেন্দ্রীয় দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদ (সিপিসিবি)-এর তথ্য অনুসারে

দুয়ের পাতায় দেখুন

পৌর স্বাস্থ্যকর্মীদের বিক্ষোভ

পৌর স্বাস্থ্যকর্মীদের মাসিক ভাতা বৃদ্ধির দাবি সহ অতিরিক্ত কাজের বোঝা কমানো, সরকারি স্বাস্থ্যকর্মীর স্বীকৃতি, মাতৃত্বকালীন ছুটি সহ সকল সরকারি ছুটি, প্রভিডেন্ট ফান্ড, পেনশন এবং ইএসআই সুবিধা সহ সামাজিক সুরক্ষার দাবিতে ৬ ফেব্রুয়ারি রাজ্যের বিভিন্ন পৌরসভা থেকে পাঁচ শতাধিক পৌর স্বাস্থ্যকর্মী সল্টলেকের নগরায়ণ দপ্তরে জমায়েত হয়ে বিক্ষোভ দেখান।

শ্রমিক সংগঠন এআইইউটিইউসি অনুমোদিত পশ্চিমবঙ্গ পৌর স্বাস্থ্যকর্মী কন্ট্র্যাকচুয়াল ইউনিয়নের রাজ্য যুগ্ম সম্পাদিকা কেকা পাল বলেন, আগাম জানানো সত্ত্বেও মন্ত্রী এদিন উপস্থিত ছিলেন না। দপ্তরের অ্যাডিশনাল ডিরেক্টর এবং স্টেট আরবান ডেভেলপমেন্ট এজেন্সির ডিরেক্টর জলি চৌধুরী প্রতিনিধি দলের সঙ্গে আলোচনা করেন এবং সমস্ত দাবির সঙ্গে সহমত পোষণ করেন।

বিক্ষোভ সভায় এ আই ইউ টি ইউ সি রাজ্য সম্পাদক কমরেড অশোক দাস উপস্থিত হয়ে আন্দোলনকারীদের সমর্থনে আন্দোলনকে শক্তিশালী করার আহ্বান জানিয়ে বক্তব্য রাখেন।

স্নানেরও অযোগ্য

একের পাতার পর

কুম্ভমেলা শুরু হওয়ার আগে গত ১৩ জানুয়ারির সমীক্ষা অনুযায়ী ত্রিবেণী সঙ্গমে বিওডি (বায়োলজিক্যাল অক্সিজেন ডিম্যান্ড)-এর মাত্রা ছিল প্রতি লিটারে ৩.৯৪ মিলিগ্রাম। ১৫ জানুয়ারি প্রথম শাহি-স্নানের পরের দিন ১৬ জানুয়ারি সেই মাত্রা গিয়ে পৌঁছায় প্রতি লিটারে ৫.০৯ মিলিমি.-এ। ২৯ জানুয়ারি মৌনী অমাবস্যার দিনে এই জলে বিওডির মাত্রা ছিল ৩.২৬ মিলিমি.। বলা প্রয়োজন, নদীতে ১১,০০০ কিউসেক অতিরিক্ত জল মেশানোর পরেও এই অবস্থা। জলে বিওডি-র মাত্রা ৩ মিলিমি-এর বেশি থাকলে সেই জল স্নানের পক্ষে নিরাপদ নয়। বিওডি-র মাত্রা যত বৃদ্ধি পাবে, জল তত বেশি দূষিত হবে। সিপিসিবি আরও বলেছে যে মহাকুম্ভের জলে মল-মূত্রে থাকা কলিফর্ম জীবাণু (কলেরা রোগের ব্যাকটিরিয়া) পাওয়া গিয়েছে। ফলে পান করা তো দূরের কথা, এই জল স্নানেরও অযোগ্য হয়ে পড়েছে।

কুম্ভমেলার আধিকারিকদের বয়ান অনুযায়ী, এ পর্যন্ত ৫৬ কোটি মানুষ কুম্ভ-স্নান সেরেছেন। এই স্নানের জন্য রাজনৈতিক নেতা-মন্ত্রী, সরকারি অফিসার, বিচারপতি, পয়সাওয়ালা ব্যক্তিদের জন্য আলাদা ভিআইপি ব্যবস্থা আছে। কিন্তু আমজনতার জন্যে যেমন উপযুক্ত ট্রেনের ব্যবস্থা নেই, থাকা-খাওয়ার সুবন্দোবস্ত নেই, তেমন স্নানের জন্যেও ভালো ব্যবস্থা নেই। এলাহাবাদ (বিজেপির দেওয়া নাম প্রয়াগরাজ) যাওয়ার পথে ২০০ কিমি দীর্ঘ ট্রাফিক-জ্যাম ঠিক তেমনই কুম্ভে স্নানের লাইনও কয়েক কিমি দীর্ঘ। মাঝে মাঝে দড়ি উঠছে, আর ভক্তরা উর্ধ্বশ্বাসে স্নানের জন্য দৌড়াচ্ছে।

যদিও ১.১৪ লক্ষ পাবলিক টয়লেট তৈরি করা ও দূরে নিয়ে গিয়ে সেই বর্জ্য শোধন করার দাবি করেছেন উত্তরপ্রদেশের মুখ্যসচিব মনোজ কুমার সিং। কিন্তু সাধারণ মানুষের অভিজ্ঞতা এবং ইতিমধ্যে সংবাদমাধ্যমে প্রকাশিত দাবিতে দেখা যাচ্ছে, ভিআইপি ঘাট ছাড়া বাকিগুলি ভয়াবহ রকমের দূষিত। এর সাথে প্রতিদিন কয়েক কোটি মানুষের আগমন ও স্নানের ফলে ত্রিবেণী সঙ্গমের জলে রোজ মিশছে ১৬ মিলিয়ন লিটার বর্জ্য মিশ্রিত জল, আর রান্না-ধোয়াধুয়ি-স্নানে ২০০ মিলিয়ন লিটার দূষিত জল।

ফলে 'অমৃতকুম্ভ' কার্যত বিষকুম্ভ হয়ে উঠেছে। অথচ বিজেপির মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ বলছেন, সঙ্গমের জল শুধু স্নানযোগ্যই নয়, 'আচমন' (পবিত্র জলপানের রেওয়াজ)-এরও যোগ্য। তিনি এই কথা বললেও সাউথ এশিয়া নেটওয়ার্ক অন ড্যামস, রিভারস অ্যান্ড পিপল (এসএএনডিআরপি)-এর সমন্বয়কারী হিমাংশু ঠক্কর বলেন, রাজ্য সরকার অত্যন্ত দায়িত্বজ্ঞানহীন হয়ে দাবি করেছে যে, নদীতে স্নান করা মানুষের কোনও ক্ষতি হয়নি, যদিও জল স্নানের অযোগ্য। তিনি বলেন, স্নানের জন্য বিশুদ্ধ জল সরবরাহ করা সরকারের নৈতিক দায়িত্ব। যখন জল নিরাপদ থাকে না, তখন সংক্রমণের ঝুঁকি সবসময়ই বেশি থাকে। বিশিষ্ট চিত্রাভিনেতা বিশাল দাদলানি আবার এক কদম এগিয়ে যোগীর উদ্দেশ্যে বলেছেন, আপনি নিজেই কুম্ভের জল খেয়ে দেখান। কুম্ভের এই দূষিত জলের এমনই মহিমা যে ৫৬ কোটি মানুষের 'পাপ ধোয়ার' পরেও উত্তরপ্রদেশ জেল প্রশাসন প্রয়াগরাজের সঙ্গম থেকে রাজ্য জুড়ে ৭৫টি জেলে পবিত্র জল আনার ব্যবস্থা করছে। বিজেপি সহ কংগ্রেস-সপার মতো দলগুলি জানে, ধর্মের জিগির তুলতে পারলে মানুষ এই সব কোনও কিছুর তোয়াক্কা করবে না। তাই তারা সকলেই একে অপরের প্রতিদ্বন্দ্বী হিসাবে সে চেষ্টাতেই ব্যস্ত। 'নমামি গঙ্গে' প্রকল্পের ৪০ হাজার কোটি টাকা কোন জলে ধুয়ে গেছে, তা নিয়ে তাদের মাথাব্যথা নেই। এমনিতেই বিজেপি তাদের এক দশকের অধিক শাসনকালে দেখিয়েছে, তাদের দলে যোগ দিলেই 'সাত-খুন মাফ' হয়ে যায়। দুর্নীতিগ্রস্তরা ক্লিনচিট পায়। এককালে যাদের বিরুদ্ধে 'হঠাও অভিযান' চালিয়েছিল বিজেপি, তাদেরই রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী বা প্রধান মুখ করে দেওয়া হয়। বিজেপির দূষিত রাজনীতি যেমন এদের পাপ ধুতে পারেনি, তেমনই এবার কুম্ভের জলে জেলের কয়েদিদের স্নান করিয়ে তাদের শোধনের অভিনব ব্যবস্থা করেছে যোগী-প্রশাসন। কিন্তু কুম্ভের দূষিত জলে সেই কয়েদিদের শোধন বা সংশোধন হবে কি?

একবিংশ শতকে মানুষকে অন্ধতা-কুসংস্কার থেকে মুক্ত করার পরিবর্তে কুম্ভের জলে স্নান করলে অমৃত-লাভের কল্পকাহিনী পরিবেশন করছে বিজেপি। সাথে সাথে নদীর স্বাস্থ্যের অবনতি ঘটিয়ে সেই দূষিত জলে যারা স্নান করছে তাদের সংক্রামক ব্যাধির দিকে ঠেলে দিচ্ছে তারা। আর এই দূষণের শিকার হচ্ছেন সেই সব হিন্দু ধর্মাবলম্বী মানুষ, বিজেপি ও সংঘ পরিবার ভোট-রাজনীতির পালে হাওয়া দিতে যাদের ক্রীড়নকে পরিণত করেছে।

কমরেড গোপাল নন্দীর জীবনাবসান

দুরারোগ্য ক্যান্সারের সঙ্গে দীর্ঘ লড়াইয়ের পর দলের বিশিষ্ট সংগঠক এবং মালদা জেলার প্রাক্তন সম্পাদক কমরেড গোপাল নন্দী ১৯ ফেব্রুয়ারি ক্যালকাটা হার্ট ক্লিনিক অ্যান্ড হসপিটালে শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন। পরদিন সকাল ১০টায় ৪৮ লেনিন সরণিতে পার্টির কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে তাঁর মরদেহ নিয়ে আসা হয়। ইতিমধ্যে সংবাদ পেয়ে কলকাতার ও মালদা জেলা সহ অন্যান্য জেলার বহু কমরেড অফিসে সমবেত হন। সাধারণ সম্পাদক কমরেড প্রভাস ঘোষের পক্ষে মাল্যদান করে শ্রদ্ধা জানান কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য কমরেড মানব বেরা, প্রবীণ পলিটবুরো সদস্য কমরেড অসিত ভট্টাচার্যের পক্ষে মাল্যদান করেন কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য কমরেড অশোক সামন্ত। পলিটবুরো সদস্য ও রাজ্য সম্পাদক কমরেড চণ্ডীদাস ভট্টাচার্য মাল্যদান করে শ্রদ্ধা জানান। পলিটবুরো সদস্য কমরেড কে রাধাকৃষ্ণ ও কমরেড স্বপন ঘোষও মাল্যদান করে শ্রদ্ধা জানান। এ ছাড়াও কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য কমরেড শঙ্কর দাশগুপ্ত, স্বপন ঘোষাল, সুভাষ দাশগুপ্ত মাল্যদান করে শ্রদ্ধা জানান। আন্তর্জাতিক সঙ্গীত পরিবেশনের পর তাঁর মরদেহ নিমতলা শ্মশানে নিয়ে যাওয়া হয় এবং সেখানেই তাঁর শেষকৃত্য সম্পন্ন হয়।

কমরেড গোপাল নন্দী ১৯৬০-'৬১ সাল নাগাদ দলের সাথে যুক্ত হয়েছিলেন উত্তর কলকাতার উল্টোডাঙা অঞ্চলের তদানীন্তন সম্পাদক বিশিষ্ট জননেতা কমরেড বাদল পাল প্রতিষ্ঠিত ফ্রি কোচিং সেন্টারে অন্যান্য অনেকের সাথে ছাত্র হিসাবে যোগ দেওয়ার মাধ্যমে। পরিবার ছিল দরিদ্র। পিতার কঠোর শাসন ছিল। তাঁর মধ্যেই কমরেড বাদল পালের স্নেহ ও সাহচর্য তাঁকে দলের কাছে নিয়ে আসে। তদানীন্তন কলকাতা জেলা সম্পাদক কমরেড আশুতোষ ব্যানার্জীও তাঁকে প্রভাবিত করেছিলেন। সংগঠন গড়ার আকাঙ্ক্ষা কমরেড গোপাল নন্দীর মধ্যে প্রথম থেকেই ছিল। এ জন্যই ডিএসও কর্মী হিসাবে তিনি বঙ্গবাসী কলেজকে বেছে নেন সেখানে সংগঠন গড়ে তুলবেন বলে। এসএফআই (তদানীন্তন বিপিএসএফ) এবং ছাত্রপরিষদের প্রবল আক্রমণের ফলে তিনি ওই কলেজে ভর্তি হতে পারেননি। উত্তর কলকাতার মণীন্দ্রচন্দ্র কলেজে ভর্তি হন। সে সময় পার্টির আহ্বানে সাড়া দিয়ে তিনি বীরভূম জেলায় সংগঠন গড়ে তোলার কাজে ঝাঁপিয়ে পড়েন। বীরভূমের গ্রামে গ্রামে ঘুরে কে কে এম এফ-এর সদস্য সংগ্রহ করেন। সে সময় বেলডাঙা কলেজকে কেন্দ্র করে নদিয়ায় ছাত্র যোগাযোগ পাওয়া যায়। তাদের ভিত্তি করে পার্টি সংগঠন গড়ার জন্য কমরেড প্রভাস ঘোষ তাঁকে নদিয়ায় পাঠান। সেখানেও তিনি ঘুরে ঘুরে যোগাযোগ বের করেন। নদিয়ায় সংগঠনের কাজ শুরুর পর্বেই স্বয়ং কমরেড শিবদাস ঘোষ তাঁকে ডেকে মালদা জেলায় সংগঠনের কাজ করবার জন্য পাঠিয়ে দেন। কোনও পরিচিতি নেই, যোগাযোগ নেই, কমরেড গোপাল নন্দী সেখানে গিয়ে নানা ভাবে পরিচিতি তৈরি করে একজন, দু'জন করে দলের সাথে যুক্ত করতে থাকেন। মালদা থেকেই তিনি পশ্চিম দিনাজপুর, বালুরঘাট, রায়গঞ্জ প্রভৃতি অঞ্চলে যান। এসব অঞ্চলে তখন দলের যোগাযোগ বিশেষ ছিল না। তিনি সেখানে পড়ে থেকে, ঘুরে ঘুরে একটি দুটি করে যোগাযোগ বের করেন এবং পার্টি ইউনিট গড়ে তোলেন। মোটরভ্যান চালকদের বিরাট সংগঠন তাঁর নেতৃত্বেই গড়ে ওঠে। পঞ্চানন্দপুর নদীভাঙন প্রতিরোধ আন্দোলনেও তিনি নেতৃত্ব দেন। বর্তমান সাধারণ সম্পাদক কমরেড প্রভাস ঘোষের আবেদনে সাড়া দিয়ে শয্যাশায়ী অবস্থাতেই তিনি তাঁর জীবন সংগ্রামের কিছু ইতিবৃত্ত লিখিত ভাবে রেখে গেছেন। যেটি পড়লে আজকের দিনের পার্টির তরুণ কর্মীরা শুধু প্রেরণা পাবে তাই নয়, কী ভাবে সহায় সম্বলহীন হয়ে শুধু মানুষের উপর আস্থা এবং আদর্শের উপর বিশ্বাস রেখে একজন তরুণ বিপ্লবী কর্মী হাটে-মাঠে ঘুরে বেড়িয়েছেন, আশ্রয়-খাওয়াদাওয়ার বিন্দুমাত্র চিন্তা না করে, সেই কাহিনিও জানতে পারবেন এবং পথচলায় রসদ পাবেন।

তাঁর সন্তানকে কলকাতায় ডাক্তারি পড়ার জন্য কলেজে ভর্তি করে নেতৃত্বের কাছে এসে বলেছিলেন, পার্টির হাতে তুলে দিয়ে গেলাম। সন্তান পিতার সেই মর্যাদা রেখেছেন। তাঁর কমরেড স্ত্রী শিক্ষকতার চাকরি করতেন। সেই সূত্রে তিনি শিক্ষা আন্দোলনেও ভূমিকা পালন করেছেন।

কমরেড গোপাল নন্দী তাঁর শেষ লিখিত আবেদনে বলেছেন, "কমরেডস, আমার জীবনের অভিজ্ঞতা দিয়েই আমি এই শেষ আবেদন করছি— যে কোনও কাজে আনন্দ আর লাগাতার প্রচেষ্টা না থাকলে সেই কাজে সফল হওয়া সম্ভব নয়। তরুণ কমরেডদের প্রতি আমার আহ্বান, পার্টির কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করুন এবং নিজেদের গুণগত মান ক্রমাগত উন্নত করুন। পরিস্থিতি বুঝে, তাৎক্ষণিক সিদ্ধান্ত এলাকাতেই নিতে হবে, এখন টেলিফোন থাকার ফলে নেতৃত্বের সাথে যোগাযোগ আগের থেকে সহজ। আমাদের সময় এই সুযোগ ছিল না।

আবার বলছি, পাড়ায় পাড়ায় আমরা যতক্ষণ না ঢুকতে পারছি, এলাকা ভিত্তিক গণআন্দোলনের পরিবেশ না গড়ে তুলতে পারছি, ততক্ষণ জনগণ আমাদের দিকে আশা নিয়েই তাকিয়ে থাকবেন। গ্রামে গ্রামে, এলাকায় এলাকায়, আমরা গণআন্দোলন গড়ে তুলি জনগণ এটাই আমাদের কাছে চাইছেন। এটা করতে পারলে আমরা খুব দ্রুত এগিয়ে যাব। মৃত্যুশয্যা থেকে এইটুকু অনুরোধ আপনাদের কাছে রেখে গেলাম।"

কমরেড গোপাল নন্দী লাল সেলাম

কেন্দ্রের হাতেই সব ক্ষমতা নিতে চায় বিজেপি

এক দেশ এক ভোট

২০১৪ সালে নরেন্দ্র মোদি প্রথমবার প্রধানমন্ত্রী হওয়ার পরই ‘এক দেশ এক ভোট’-এর পক্ষে প্রচার শুরু করেন। যদিও তিনিই প্রথম নন। ১৯৯৯ সালে বিজেপি নেতা অটলবিহারী বাজপেয়ীর শাসনকালে বি পি জীবন রেড্ডির নেতৃত্বাধীন আইন কমিশন ‘এক দেশ এক ভোট’ প্রসঙ্গে আলোচনাকে সামনে তুলে ধরেছিল। ২০১৮ সালে লোকসভা নির্বাচনের আগে আইন কমিশন দেশ জুড়ে লোকসভা, বিধানসভা এবং তার নির্দিষ্ট একটা সময়সীমার মধ্যে পুরসভা ও পঞ্চায়েতের নির্বাচন একই বছরে আয়োজন করার প্রস্তাব দেয়। এর জন্য প্রয়োজনীয় নির্বাচনবিধি, জনপ্রতিনিধিত্ব আইন সংশোধনের প্রস্তাবও দেওয়া হয়। সেই উদ্দেশ্যে গত বছর প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি রামনাথ কোবিন্দকে চেয়ারম্যান করে একটি কমিটি গঠন করেছিল কেন্দ্রীয় সরকার। স্বভাবতই সেই কমিটির অধিকাংশ সদস্যই ছিলেন বিজেপি ঘনিষ্ঠ। ২০২৪ সালের মার্চ মাসে লোকসভা ভোটের ঠিক আগে সেই কমিটি সারা দেশে সমস্ত ধরনের ভোট একসঙ্গে করার সুপারিশ করে একটি বিশাল রিপোর্ট জমা দেয়।

১৭ ডিসেম্বর কেন্দ্রীয় আইন মন্ত্রী এই প্রসঙ্গে লোকসভায় দুটি বিল পেশ করেন। প্রথমটি, লোকসভা এবং রাজ্যের বিধানসভা নির্বাচন একসঙ্গে করা। দ্বিতীয়টি, লোকসভার সাথে কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল পুদুচেরি, দিল্লি, জম্মু ও কাশ্মীরের বিধানসভা নির্বাচন সম্পন্ন করা। কিন্তু এই বিলগুলিকে কার্যকর করতে হলে একদিকে ১৯৫০ ও ১৯৫১ সালের জনপ্রতিনিধিত্ব আইনের পরিবর্তন করতে হবে এবং অন্যদিকে সংশোধনের দ্বারা সংবিধানের ৮৩, ৮৫, ১৭২, ১৭৪ এবং ৩৫৬ ধারার পরিবর্তন করতে হবে। এইসব সংশোধন বা পরিবর্তন করতে গেলে লোকসভা ও রাজ্যসভার দুই-তৃতীয়াংশ সদস্যের সমর্থন প্রয়োজন। অথচ বিজেপি বা এনডিএ-র সে শক্তি এখন নেই। বর্তমানে সেই বিল যৌথ সংসদীয় কমিটিতে পাঠানোর কথা হয়েছে। প্রশ্ন হল, এত কিছুর মধ্যে দিয়ে ‘এক দেশ এক ভোট’-এর ব্যবস্থা চালু করার উদ্দেশ্য কী এবং এত তৎপরতাই বা কী উদ্দেশ্যে?

বিজেপির যুক্তি

বিজেপির যুক্তি, এ দেশে প্রথম সাধারণ নির্বাচন থেকে বিধানসভা নির্বাচন একসঙ্গে অনুষ্ঠিত হয়েছে। তখন যদি তা হয়ে থাকতে পারে এখন অসুবিধা কোথায়? দ্বিতীয়ত, বারবার নির্বাচনের ফলে যে বিপুল অর্থ ব্যয় হচ্ছে, একত্রে নির্বাচন হলে তা কমানো সম্ভব হবে। তৃতীয়ত, বারবার নির্বাচনের জন্য বারবার নির্বাচনী বিধি চালু করতে হয়। দীর্ঘদিন প্রশাসনের একটা অংশকে নির্বাচনের কাজে যুক্ত থাকতে হয় এবং সরকারের বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্পের কাজ বন্ধ থাকে, তাতে জনস্বার্থ বিঘ্নিত হয়। চতুর্থত, বারবার নির্বাচনে নিরাপত্তা বাহিনী নিয়োগের ক্ষেত্রে অসুবিধা হয়। পঞ্চমত, বারবার ভোট দিতে আসতে হলে পরিযায়ী শ্রমিকদের খুবই অসুবিধা হয়। অনেক শ্রম দিবস নষ্ট হয়।

যুক্তির অসারতা

এ কথা ঠিক, প্রথম সাধারণ নির্বাচন থেকে কয়েকবার লোকসভা ও বিধানসভার নির্বাচন একসঙ্গে অনুষ্ঠিত হয়েছে। ১৯৫৭ থেকে কংগ্রেসী অপশাসনের বিরুদ্ধে গড়ে ওঠা তীব্র জনরোষের ফলে কেন্দ্রে এবং রাজ্যে ভিন্ন দলের সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়। কেন্দ্রের শাসন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত কংগ্রেস সরকার তাদের সঙ্কীর্ণ দলীয় স্বার্থে বিভিন্ন রাজ্যের নির্বাচিত সরকারকে ভেঙে রাষ্ট্রপতি শাসন জারি করার রাস্তা নেয়। এর ফলে হতে থাকে অন্তর্বর্তী নির্বাচন। পাশাপাশি কারও অকালমৃত্যু, পদত্যাগ, কিছু বিধানসভা সদস্যের লোকসভা বা রাজ্যসভায় নির্বাচিত হওয়া সহ নানা কারণেও নির্বাচন করতে হয়। এই অবস্থায় অবশ্যম্ভাবী রূপে বারবার নির্বাচনের প্রশ্ন আসেই। এই অন্তর্বর্তী নির্বাচনে যারা বিধানসভার ক্ষমতায় এল তাদের পাঁচ বছরের মেয়াদ শেষ হওয়ার আগেই লোকসভা নির্বাচনের সময় চলে আসে। বিভিন্ন রাজ্যের অন্তর্বর্তী নির্বাচনও হয় বিভিন্ন সময়ে। তাই একত্রে লোকসভা এবং সমস্ত বিধানসভা নির্বাচন সম্ভব হয় না। একবার একসাথে নির্বাচন করলেও পরবর্তী সময়ে আর একসাথে করা সম্ভব হয় না। এই অবস্থা কি বাস্তব নয়? কেন্দ্র ও রাজ্যের নির্বাচন একসঙ্গে করার বিধি চালু করার দ্বারা অন্তর্বর্তী নির্বাচনে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত রাজ্য সরকারের গণতান্ত্রিক অধিকারকে খর্ব করা হয় না কি?

দ্বিতীয়ত, বিপুল অর্থব্যয়ের যে কথাটি বিজেপি উত্থাপন করতে চাইছে তা আদৌ কি তথ্যসম্মত? তা বিচার করার আগে যে নৈতিক প্রশ্ন স্বাভাবিকভাবেই দেখা দেয় সেটি হল, যে দল নির্বাচনে জৌলুস সৃষ্টি করতে, প্রচারে, ভোট কিনতে, অন্য দলের বিজয়ী প্রার্থীদের কোটি কোটি টাকা দিয়ে কিনে গদি দখলে সিদ্ধহস্ত, যারা নির্বাচনী বন্ডের মাধ্যমে কোটি কোটি টাকা তোলে, তাদের মুখে নির্বাচনে খরচ কমানোর কথা কোনও ভাবেই মানায় কি! শুধু তাই নয়, যিনি এই ব্যবস্থার জন্য প্রবল উদ্যোগী হয়ে উঠেছেন সেই প্রধানমন্ত্রী ঘনঘন বিদেশ যাত্রা আর বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে আত্মপ্রচারের জন্য জনসাধারণের কষ্টার্জিত রাজস্বের হাজার হাজার কোটি টাকা খরচ করছেন। অন্য দিকে পুঁজিপতিদের কর ছাড় দেওয়ার পরিমাণ দেশের মোট অভ্যন্তরীণ উৎপাদনের দুই শতাংশেরও বেশি। এ কথাও তো অস্বীকার করার উপায় নেই যে, একত্রে সমস্ত নির্বাচন পরিচালনা করতে গেলে যে সংখ্যক ইভিএম লাগবে তার জন্য সরকারি হিসাবেই খরচ হবে ৮ হাজার কোটি টাকা। তাই সবকিছুকে একত্রে বিচার করে দেখলে অর্থব্যয়ের যুক্তিটি একটি অজুহাত মাত্র।

তৃতীয়ত, বারবার নির্বাচনে উন্নয়ন থমকে যাবার কথাটি কি আদৌ সত্য? পাঁচ বছরে ক’বার নির্বাচন হয়? তিন বার। তাতে বড়জোর ৩-৪ মাস নির্বাচনী বিধি বলবৎ থাকে। বাকি সময়ে তো নির্বাচন থাকে না। তখন কি উন্নয়নের জোয়ার বয়? তা ছাড়া উন্নয়ন বলতে কী বোঝায়? রাস্তাঘাটের উন্নয়ন, ফ্লাইওভারের উন্নয়ন, শিলান্যাস, এসবে তো ভোটের মরশুমে ঝড় বয়ে যায়। আর উন্নয়ন বলতে যদি জনগণের আর্থিক উন্নতি, কর্মসংস্থান ইত্যাদি বোঝায় তা হলে তার সাথে নির্বাচনের সম্পর্ক কী? দেশবাসী কি জানে না যে, যতটুকু উন্নয়নের কাজ হচ্ছে, বাস্তবে কার উন্নয়ন ঘটছে? উন্নয়ন হচ্ছে তো বৃহৎ পুঁজি বা কর্পোরেট মালিকদের, বড় বড় ব্যবসাদারদের। জনসাধারণের জীবনে উন্নয়ন কোথায়? শতকরা এক শতাংশ মানুষের হাতে দেশের বেশিরভাগ সম্পদ কেন্দ্রীভূত হওয়া এবং জনসাধারণের জীবনের হাহাকারই কি সেই উন্নয়নের মিথ্যা প্রহসনের বাস্তব চিত্র নয়?

চতুর্থত, একসাথে নির্বাচনে নিরাপত্তা রক্ষী নিয়োগের সুবিধা হবে, আলাদা আলাদা হলে তার অসুবিধা হবে— এর কোনও সারবত্তা নেই শুধু নয়, ঘটনা ঠিক তার বিপরীত। বরং একত্রে নির্বাচনে নিরাপত্তারক্ষীর উপযুক্ত সংখ্যায় নিয়োগ করাটাই অসুবিধাজনক। তাই এটি নিজেদের স্বার্থসিদ্ধিতে ‘যুক্তি’ উত্থাপনের কূট কৌশল ছাড়া আর কিছু নয়।

পঞ্চমত, পরিযায়ী শ্রমিকদের অবর্ণনীয় দুরবস্থা, যেখানে তারা কাজ করতে বাধ্য সেখানে তাদের নিরাপত্তার বিষয় এবং লকডাউনের সময়ে তাদের প্রতি কেন্দ্রীয় সরকারের চরম নিষ্ঠুরতার ঘটনা দেশবাসী ভুলে যায়নি। করোনার সময় ফিরতে গিয়ে অসহায় ভাবে যাদের প্রাণ দিতে হয়েছে, অনিদ্রায় অনাহারে অবর্ণনীয় দুর্দশার মধ্যে পড়তে হয়েছে, আব্রু বিসর্জন দিয়ে যাদের রাস্তায় সন্তানের জন্ম দিতে হয়েছে, যাদের মরদেহকে তাদের শিশুসন্তান ‘মা’ ‘মা’ বলে ব্যর্থ আর্তি জানিয়ে চলেছে একটু খাবারের জন্য, রেলের লাইনে যাদের ছেঁড়া শুকনো রুটি আর তাদেরই এক দলের ছিন্নভিন্ন দেহাংশ ছড়িয়ে পড়তে দেখা গিয়েছে— তাদের অসুবিধার কথা বলা বিজেপি নেতা-মন্ত্রীদের কৌশলী মিথ্যা ভাষণ ছাড়া আর কী-ই বা হতে পারে! এই যুক্তিটি আসলে বৃহৎ পুঁজিপতি এবং কর্পোরেট মালিকদের যুক্তির সঙ্গে একই সুরে উত্থাপিত। তারা এই অসুবিধাকে চিহ্নিত করেছে ‘পলিসি প্যারালাইসিস’ হিসাবে। এর পিছনে যে তাদের বিপুল মুনাফা অর্জনের প্রশ্নটি যুক্ত— এ কথা সকলেই সহজে বুঝতে পারবেন।

যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামো ব্যাহত হবে

আসলে বিজেপি এবং প্রধানমন্ত্রীর নরেন্দ্র মোদির আসল উদ্দেশ্যটি অন্যত্র নিহিত। তাঁরা ‘এক দেশ এক ভোট’ এর প্রশ্নটিই শুধু উত্থাপন করছেন তাই নয়, ‘এক দেশ এক ট্যাক্স’, ‘অভিন্ন দেওয়ানি বিধি’, ‘এক দেশ এক সংস্কৃতি’ এবং সর্বোপরি ‘এক দেশ এক নেতা’ সহ আরও বহু বিষয় উত্থাপনের মধ্য দিয়ে দীর্ঘদিন ধরে চূড়ান্ত কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণ বা সহজ কথায় দলীয় নিয়ন্ত্রণ কায়েম করার প্রবল প্রচেষ্টা চালিয়ে আসছেন। এর নিরিখে বিচার করতে হবে ‘এক দেশ এক ভোট’-এর বিষয়টিকে। প্রথমেই ভাবতে হবে, এই দেশ কি সত্যিই এক? দেশটি কি প্রধানত দুটি শ্রেণিতে বিভক্ত নয়? একদিকে শাসক বুর্জোয়া শ্রেণি, পুঁজিপতি, বড় বড় ব্যবসাদার, আর অপরদিকে গরিব কৃষক শ্রমিক নিম্নবিত্ত সহ কোটি কোটি জনসাধারণ। দু পক্ষের স্বার্থ পরস্পরবিরোধী। ধনী গরিব বৈষম্য আজ চূড়ান্ত বাস্তব। শুধু এই বৈষম্যই নয়, আমাদের দেশ নানা ধর্ম, নানা বর্ণ, নানা সম্প্রদায়, নানা ভাষাভাষী জনসাধারণে বিভক্ত। অস্বীকার করা যায় না, দেশের নানা রাজ্যের মানুষের নানা ধরনের আঞ্চলিক সমস্যা, দাবি-দাওয়া, নানা ধরনের আচার-সংস্কৃতি বিদ্যমান। এগুলিকে ফরমান জারি করে এক রকম করা যায় না। এই কারণেই যুক্তরাষ্ট্রীয় বৈশিষ্ট্য নিয়েই দেশের নির্বাচনী ব্যবস্থা গড়ে উঠছে। এক দেশ এক ভোট ব্যবস্থা যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোকে আঘাত করবে।

এক দেশ-এক ট্যাক্স রাজ্যগুলিকে কেন্দ্রের মুখাপেক্ষী করে তুলেছে

অন্য দিকে ‘এক দেশ এক ট্যাক্স’ (জিএসটি) -এর দ্বারা ট্যাক্সের কাঠামো সরলীকরণের নামে এই জিএসটি অর্থনৈতিক কেন্দ্রীকরণের পথকেই প্রশস্ত করেছে। এটাই সকলের অভিজ্ঞতা। সকলেই জানেন, রাজ্যগুলিকে কেন্দ্রের কতখানি মুখাপেক্ষী করেছে। ‘এক দেশ এক ট্যাক্সে’র দ্বারা রাজ্যগুলিকে ক্রমাগত আরও কেন্দ্রের মুখাপেক্ষী বা নির্ভরশীল করার মধ্য দিয়ে যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোকেই আঘাত করা হচ্ছে।

এই প্রসঙ্গে কনস্টিটিউশন অ্যাসেম্বলির বিশিষ্ট সদস্য শিববান লালা সাকসেনা সংবিধানের খসড়া তৈরির সময় ১৯৪৯ সালে বলেছিলেন যে, ‘আমাদের সংবিধানে সব নির্বাচনকে একসাথে করা হবে না— নানা রাজ্যে আস্থা ভোট সহ নানা কারণে বিভিন্ন সময় নির্বাচন করতে হবে। আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের মতো তা হবে না।’ প্রসঙ্গত এ-ও উল্লেখ্য যে, বহুপূর্বে রাষ্ট্র পতি-প্রধান শাসনব্যবস্থার প্রশ্নটি উত্থাপিত হলেও তা বাস্তবায়িত করা সম্ভব হয়নি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে আমাদের দেশের বৈশিষ্ট্যের পার্থক্যের জন্য। তিনি এ-ও বলেছিলেন, ‘বিভিন্ন বিধানসভা এবং কেন্দ্রের নির্বাচন একসাথে করা সম্ভব নয়।’ অন্য আর এক বিশিষ্ট সদস্য আর কে সিদ্ধান্তও একই কথা বলেছেন। অথচ কেন্দ্রের বিজেপি সরকার এবং তার প্রধানমন্ত্রী এর সম্পূর্ণ বিপরীত কাজটি করতে উদ্যত হয়েছেন।

রাজনৈতিক কেন্দ্রীকরণ একচেটিয়া পুঁজির স্বার্থেই

বাস্তবে দেশ জুড়ে বিজেপির একচ্ছত্র আধিপত্য কায়েমের পথে বাধা হিসাবে দাঁড়িয়ে আছে আঞ্চলিক এবং ছোট দলগুলি। আঞ্চলিক পুঁজিকে কেন্দ্র করে আঞ্চলিক দলগুলির অস্তিত্ব ক্ষমতার চূড়ান্ত কেন্দ্রীভবন ঘটানোর পথে অসুবিধা তৈরি করছে। এই অবস্থায় আঞ্চলিক দলগুলিকে নিশ্চিহ্ন করে একচেটিয়া পুঁজির অনুগত দুটি জাতীয় দলের অস্তিত্ব টিকিয়ে রেখে বনেদি পুঁজিবাদী দেশগুলির মতো দ্বিদলীয় ব্যবস্থা কায়েম করাই এর উদ্দেশ্য।

বেশ কিছু সমীক্ষায় দেখা যাচ্ছে, ভোট একসঙ্গে হলে, যেহেতু ভোটারদের বেশিরভাগই রাজনৈতিক ভাবে অসচেতন, ভোটারদের লোকসভা ও বিধানসভায় একই দলকে ভোট দেওয়ার প্রবণতা বেড়ে যায়। আবার ভোট একসঙ্গে হলে, প্রার্থীর নাম, জাতপাত, স্থানীয় বা জাতীয় রাজনৈতিক সমস্যা ইত্যাদি সবকিছুকে ছাপিয়ে মূলত রাজনৈতিক দলের চিহ্ন দেখে ভোট দিতে দেখা যায়।

একসঙ্গে ভোট হলে, ভোটের দিনের আগেই, বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই রাজনৈতিক প্রচারের সময় মানুষ ঠিক করে ফেলেন কোন দলকে ভোট দেবেন। আলাদা সময়ে ভোট হলে ভোটাররা দলের চিহ্ন ছাড়াও আরও অনেক কিছু দেখে ভোট দিতে পারেন। আবার একই দলকে ভোট দিতে হলে কোনও সর্বভারতীয় দলকেই দিতে হবে, যেহেতু লোকসভায় আঞ্চলিক দলগুলি তত প্রাসঙ্গিক নয়, এই নিরিখে সর্বভারতীয় দলগুলিই এগিয়ে থাকবে

ছয়ের পাতায় দেখুন

কোচবিহারে মিড ডে মিল কর্মীদের আন্দোলন

সারা বাংলা মিড ডে মিল কর্মী ইউনিয়নের কোচবিহার জেলা শাখার পক্ষ থেকে ২১ ফেব্রুয়ারি জেলা স্কুল শিক্ষা আধিকারিকের মাধ্যমে শিক্ষামন্ত্রীর উদ্দেশে স্মারকলিপি দেওয়া হয়। পরে কেন্দ্রীয় ও রাজ্য বাজেটের প্রতিলিপি পোড়ানো হয়।

শতাধিক মিড-ডে মিল কর্মী অংশগ্রহণ করেন। নেতৃত্ব দেন ইউনিয়নের রাজ্য কমিটির যুগ্ম সম্পাদিকা মনোরমা হালদার, রিনা ঘোষ, মঞ্জু সাহা, মামনি বর্মন, পারুল বর্মন প্রমুখ নেতৃবৃন্দ। দাবি ছিল— রাজ্য বাজেটে মিড-ডে মিল প্রকল্পে কর্মীদের বেতন বৃদ্ধি সহ অন্যান্য বরাদ্দ বাড়াতে হবে, দশ মাস নয় ১২ মাসের

বেতন দিতে হবে, মিড-ডে মিল কর্মীদের সরকারি কর্মীর স্বীকৃতি দিতে হবে এবং অবসরকালীন ৫ লক্ষ টাকা ভাতা পিএফ পেনশন গ্র্যাচুইটি দিতে হবে, কোনও মিড-ডে মিল কর্মীকে ছাঁটাই করা চলবে না।

আর জি কর আন্দোলন

একের পাতার পর

রাজ্য প্রশাসন। ডাঃ অনিকেত, ডাঃ কিঞ্জলদের নেতৃত্বে প্রথম প্রতিরোধ গড়ে উঠেছিল যে, না এ আত্মহত্যা নয়, এক পরিকল্পিত হত্যা। এটাই কিন্তু ছিল আন্দোলন গড়ে উঠবার প্রেক্ষাপট।

এ আন্দোলনে আরেকটি বিষয় লক্ষণীয়। আন্দোলন চলার সময়েও ডাক্তার এবং রোগী ও রোগীর পরিজনদের আবেগের ও শ্রদ্ধার সম্পর্ক নষ্ট হয়নি। ডাক্তারদের কর্মবিরতিতে মানুষ অসুবিধায় পড়লেও এত বড় খুনের ঘটনার প্রতিবাদ না করে বসে থাকেনি। তারাও আন্দোলনে সক্রিয় অংশগ্রহণ করেছিল। বর্তমান ও অতীতের সমস্ত শাসকই চেষ্টা করে ডাক্তার নার্স স্বাস্থ্যকর্মী এবং রোগী-এর মধ্যে একটা যুদ্ধ জারি রাখতে। কারণ তাতে শাসকের লাভ। কিন্তু এবার সেই ষড়যন্ত্র সফল হয়নি।

অন্যদিকে এই আন্দোলনে নারী সমাজের জাগরণ এক অভূতপূর্ব বিষয়, যা আগে কখনও এইরূপে দেখা যায়নি। এই সময় যেখানেই আর জি কর আন্দোলনের উত্তাপ ছড়িয়ে পড়েছে— শহর-মফঃস্বলে, এমনকি কিছু কিছু গ্রামেও, সেখানে আন্দোলনে অংশগ্রহণকারী মানুষের মধ্যে নৈতিকতার ও চেতনার উন্নয়ন ঘটেছে। ৬ মাস আগে আন্দোলন শুরু হওয়ার পূর্বের মানুষ আজ আর একই রকম নেই, নিজেদের অজান্তেই যেন পাল্টে গেছে।

এই আন্দোলনের আরেকটি বড় দিক, পুলিশ প্রশাসন সিবিআই আদালত সম্পর্কে মানুষের মোহ কিছুটা ধাক্কা খেয়েছে। যাঁদের মানুষ অনেকটা দেবতার আসনে রাখতে অভ্যস্ত ছিল সেই বিচারপতিদের সম্পর্কে মানুষের মধ্যে প্রশ্ন জেগেছে। শিয়ালদা কোর্ট, কি সুপ্রিম কোর্ট কোথাও অভয়ার খুনের ন্যায়বিচার মানুষ পায়নি। কিন্তু জনতার আদালতে আসল খুনি কারা তা প্রমাণিত হয়েছে।

রাজ্য ও কেন্দ্র সরকার উভয়েই অভয়ার ন্যায়বিচারের আন্দোলনকে দমিয়ে দেওয়ার তীব্র চেষ্টা করেছে। একদিকে রাজ্য সরকারের ভয়, অভয়ার খুনের সঙ্গে যুক্ত দুর্নীতিগ্রস্ত ব্যক্তিরা যে শাসকদলের ঘনিষ্ঠ, সেটা মানুষের সামনে চলে আসবে। আর অন্যদিকে আন্দোলনের আগুন যদি বিজেপি শাসিত রাজ্যগুলিতে ছড়িয়ে পড়ে তবে সেই সব রাজ্যে প্রতি মিনিটে যে খুন ধর্ষণ ঘটছে তার বিরুদ্ধে মানুষ ন্যায়বিচারের দাবিতে রাস্তায় নামবে, যা কেন্দ্রীয় শাসকের কাছে অভিপ্রেত নয়। ফলে আর জি করের ন্যায়বিচারের আন্দোলন দমন করার ক্ষেত্রে রাজ্য এবং কেন্দ্র উভয়ের স্বার্থ মিলে গেছে। তাই আমাদের অবাক হওয়ার কোনও কারণ নেই যখন দেখা গেল, সুপ্রিম কোর্ট স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে অভয়ার বিচারের পর্যবেক্ষণের দায়িত্ব নিজে নিল এবং রাজ্য ও কেন্দ্রীয় প্রশাসন উভয়েই এই সিদ্ধান্তকে সমর্থন জানাল।

এই আন্দোলনের ফলে মেডিকেল কলেজগুলির মধ্যে থাকা পাহাড়প্রমাণ দুর্নীতির চক্র ফাঁস হয়ে গেছে। আর এই হত্যাকাণ্ড যে দুর্নীতি চক্রের ফলশ্রুতিতে তাও অজানা নেই। এই আন্দোলনের অভিঘাতে রাজ্য প্রশাসনের ভিত টলে গিয়েছিল। অতীতে এভাবে কেউ এই প্রশাসনকে এতটা মাথা নত করতে বাধ্য করতে পারেনি। আন্দোলনের চাপে স্বাস্থ্যদপ্তর ও পুলিশ প্রশাসনের অনেক কর্তাব্যক্তিকে অপসারণ করতে বাধ্য হয়েছিল রাজ্য প্রশাসন।

সঠিক পথে গড়ে ওঠা কোনও আন্দোলন অভীষ্ট লক্ষ্যে শেষ পর্যন্ত পৌঁছতে না পারলেও তা কোনওদিন ব্যর্থ হতে পারে না। আমরা তো গান্ধীজির অসহযোগ আন্দোলন, '৪২-এর ভারত ছাড়ো আন্দোলন, সুভাষ বোসের আত্মত্যাগ ব্যর্থ হয়েছে বলে কখনও মনে করি না। যদিও এই সমস্ত ঐতিহাসিক ঘটনাগুলি ঘটে যাওয়ার পরপরই আমাদের দেশ স্বাধীন হয়নি। তারপরেও বেশ সময় লেগেছে। তাই হতাশার কোনও জায়গা নেই। ন্যায়বিচারের আন্দোলনকে আমাদের চালিয়ে যেতে হবে, যতক্ষণ না পর্যন্ত প্রকৃত খুনি কারা, খুনের উদ্দেশ্য কী ছিল আমরা জানতে না পারি। না হলে আগামী দিন যে কোনও মুহূর্তে আরেক জন 'অভয়া' তৈরি হবে।

যে কোনও আন্দোলনেরই ওঠানামা থাকে। তাই এই আন্দোলনটিও এর ব্যতিক্রম নয়। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, এই আন্দোলনে ছিল দুটি ধারা। একটি ধারা ছিল ন্যায়বিচারের দাবিতে সর্বাত্মক প্রতিবাদ সংগঠিত করা। আরেকটি ধারা ছিল এই আন্দোলনকে নির্বাচনমুখী করে রাজনৈতিক স্বার্থসিদ্ধি করা। আন্দোলনের নামে মহড়া দেওয়া। শেষ পর্যন্ত প্রথম ধারাটি মানুষের মনে আবেগের সাথে স্থান করে নিয়েছে এবং ওয়েস্ট বেঙ্গল জুনিয়র ডক্টরস ফ্রন্টের নেতৃত্বকে মানুষ সাদরে গ্রহণ করেছে। কোনও মূল্যেই আন্দোলনের পথ ছাড়লে চলবে না। যতই আন্দোলনকারী ডাক্তারদের ওপর আঘাত আসুক, মানুষ তার লড়াইয়ের সাথীকে ঠিক চিনে নেবে। ইতিহাস বলে, সঠিক পথে দৃঢ়ভাবে লড়তে গেলে কিছু মূল্য দিতে হয়, আবার ইতিহাস তার হিসেব মিলিয়ে দেয়। মানুষের মনের মধ্যে এখনও আন্দোলনের যে আগুন জ্বলছে, তা যে কোনও দিন আবার অগ্ন্যুৎপাতের রূপে ফেটে পড়তে পারে। তখন শাসক ন্যায়বিচার না দিয়ে পার পাবে না।

স্বাস্থ্যে আসল প্রশ্ন থেকে নজর ঘোরানোর চেষ্টা মুখ্যমন্ত্রীর

২৪ ফেব্রুয়ারি কলকাতার ধনধান্য সভাগৃহে আয়োজিত সভায় মুখ্যমন্ত্রী যে ভাবে স্বাস্থ্যক্ষেত্রে মূল সমস্যাগুলিকে এড়িয়ে গেলেন তারই পরিপ্রেক্ষিতে এস ইউ সি আই (সি)-র রাজ্য সম্পাদক চণ্ডীদাস ভট্টাচার্য ওই দিন এক বিবৃতিতে বলেন,

আজকের সভায় অভয়ার প্রকৃত খুনিদেরা ধরা, মেডিকেল কলেজগুলিতে থ্রেট কালচার বন্ধ, স্বাস্থ্যক্ষেত্রে দুর্নীতিগ্রস্তদের বিরুদ্ধে ও স্যালাইন কাণ্ডে অভিযুক্ত কোম্পানির বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা, তাঁর নিজেরই প্রতিশ্রুতি মতো রাজ্যভিত্তিক টাস্ক ফোর্স কার্যকর করা সহ মূল বিষয়ে সদর্থক ভূমিকা না নিয়ে জুনিয়র ডাক্তারদের মাইনে কিছুটা বাড়িয়ে স্বাস্থ্যক্ষেত্রের মূল সমস্যা থেকে দৃষ্টি ঘুরিয়ে দেওয়ার যে চেষ্টা মুখ্যমন্ত্রী করলেন— আমরা তার তীব্র প্রতিবাদ করছি। মুখ্যমন্ত্রীর নেতৃত্বে আজকের এই সভা পশ্চিমবঙ্গের চিকিৎসক ও গণতন্ত্রপ্রিয় জনসাধারণকে প্রবল ভাবে ক্ষুব্ধ করেছে। আমরা অভয়ার ন্যায় বিচার ও স্বাস্থ্যব্যবস্থাকে ত্রুটিমুক্ত করার দাবিতে জুনিয়র ডাক্তার সহ সাধারণ মানুষের আন্দোলনে আরও এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য রাজ্যের মানুষের কাছে আবেদন জানাচ্ছি।

১৮ ফেব্রুয়ারি হাওড়ায় বিদ্যাসাগর ফ্রি কোচিং সেন্টার এবং পথের দাবি ট্রাস্টের যৌথ উদ্যোগে ৪৩ জন দুঃস্থ ছাত্রছাত্রীর হাতে পাঠ্যপুস্তক তুলে দেওয়া হয়। এই অনুষ্ঠানে কোচিং সেন্টারের শিক্ষকরা ছাড়াও নলপুর রঘুদেববাটী হাইস্কুলের টিচার ইনচার্জ সৌমেন্দু বেরা এবং বি গার্ডেন, নেতাজি ফ্রি কোচিংসেন্টারের ইনচার্জ সেলিনা আলম উপস্থিত ছিলেন। উপস্থিত ছিলেন বহু অভিভাবকও।

শুধু কাজের নয়, অফিস হবে জ্ঞানচর্চা ও চরিত্রসাধনার কেন্দ্র, বললেন রাজ্য সম্পাদক

দক্ষিণ ২৪ পরগণার জয়নগর ১ নং ব্লকে খাকুড়দহ-জাঙ্গালিয়ার শান্তিপুরে ২০ ফেব্রুয়ারি নবরূপে নির্মিত পার্টি অফিস উদ্বোধন করলেন দলের পলিটবুরো সদস্য ও রাজ্য

সম্পাদক কমরেড চণ্ডীদাস ভট্টাচার্য। অত্যন্ত অসুস্থ শরীরে চিকিৎসকের অনুমতি নিয়ে হাসপাতালের শয্যা থেকে এসে এই অনুষ্ঠানে পতাকা উত্তোলন করেন এলাকার প্রবীণ নেতা, অবিভক্ত দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলা সম্পাদকমণ্ডলীর প্রাক্তন সদস্য কমরেড পাঁচু নস্কর। কমরেড চণ্ডীদাস ভট্টাচার্য বলেন, এসইউসিআই(সি) প্রতিষ্ঠা লগ্নে ঐতিহাসিক তেভাগা আন্দোলনের মধ্য দিয়ে দক্ষিণ ২৪ পরগণার বিস্তীর্ণ অঞ্চলে পার্টির গণভিত্তি স্থাপিত হয়। তিনি অগণিত শহিদের আত্মদান ও বহু কর্মীর অসামান্য সংগ্রামের কথা স্মরণ করেন। খাকুড়দহ-জাঙ্গালিয়ায় দলের বিস্তারে কমরেড পাঁচু নস্করের অগ্রণী ভূমিকার কথা এবং রাজ্য কমিটির প্রয়াত সদস্য ও জয়নগর ১ নং ব্লকের জনপ্রিয় নেতা কমরেড অজয় সাহার বলিষ্ঠ ভূমিকার কথা তিনি স্মরণ করেন। তিনি বলেন, অফিসের অভাবে নানা স্থানে অনেক অসুবিধার মধ্যে দলীয় সভা করতে হয়েছে। তখন থেকেই কমরেড অজয় সাহা শান্তিপুরে বড় আকারে অফিস নির্মাণের সংকল্প গ্রহণ করেন। এটা খুবই বেদনার যে অফিস উদ্বোধনের এই আনন্দের দিনে তিনি আমাদের মধ্যে নেই। কমরেড চণ্ডীদাস ভট্টাচার্য বলেন, এই অফিসকে কেবল কাজের কেন্দ্র নয়, জ্ঞান-চর্চা ও চরিত্র সাধনার কেন্দ্র হিসাবে গড়ে তুলতে হবে।

অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি ছিলেন কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য কমরেড দেবাশীষ রায় ও অশোক সামন্ত, রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য, বারুইপুর সাংগঠনিক জেলা কমিটির সম্পাদক কমরেড নন্দ কুণ্ডু। উপস্থিত ছিলেন রাজ্য কমিটির সদস্য ও কাকদ্বীপ সাংগঠনিক জেলা কমিটির সম্পাদক কমরেড সুজিত পাত্র এবং রাজ্য কমিটির সদস্য কমরেড গোপাল সাহু। বৃষ্টিভেজা আবহাওয়া সত্ত্বেও শতাধিক পার্টি কর্মী ও স্থানীয় বহু মানুষ উপস্থিত ছিলেন। সভাপতিত্ব করেন দলের আঞ্চলিক কমিটির সম্পাদক কমরেড মধুসূদন দাস।

কেরালায় লাগাতার ধরনায় আশাকর্মীরা

কেরালায় এআইইউটিইউসি অনুমোদিত আশা হেলথ ওয়ার্কার্স অ্যাসোসিয়েশনের ডাকে ১০ ফেব্রুয়ারি থেকে রাজ্য সচিবালয়ের সামনে লাগাতার ধরনায় শামিল হয়েছেন হাজার হাজার আশাকর্মী। তাঁদের দাবি, রাজ্যের ন্যূনতম মজুরির সঙ্গে সমতা রেখে আশাকর্মীদের সাম্মানিক ২১ হাজার টাকা করতে হবে, অবসরপ্রাপ্তদের ৫ লক্ষ টাকা দিতে হবে এবং তা না দিয়ে কোনও কর্মীর অবসর ঘোষণা করা চলবে না, আশাকর্মীদের উপর দায়িত্বের প্রবল চাপ কমাতে হবে প্রভৃতি। সংগঠনের রাজ্য সভাপতি ভি কে সদানন্দম, সাধারণ সম্পাদক এম এ বিন্দু ও রাজ্য সহসভাপতি এস মিনি সহ নেতৃবৃন্দের আহ্বানে এই ধরনায় যোগ দিয়েছেন হাজার হাজার আশাকর্মী।

বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে যথেচ্ছ ফি
সরকারের নিষ্ক্রিয়তার প্রতিবাদ

বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে যথেচ্ছ ফি আদায় বন্ধ করতে রাজ্য সরকার নিষ্ক্রিয়। রাজ্য সরকারের এই ভূমিকা নিয়ে হাইকোর্টের বিচারপতির মন্তব্য প্রসঙ্গে এআইডিএসও-র পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সম্পাদক বিশ্বজিৎ রায় ২১ ফেব্রুয়ারি এক বিবৃতিতে বলেন,

সারা দেশের পাশাপাশি এই রাজ্যের সরকারি শিক্ষাব্যবস্থা ক্রমশ ধ্বংস হচ্ছে। পরিকাঠামো ও শিক্ষকের অভাব, সরকারি শিক্ষা ব্যবস্থার প্রতি সরকারের অবহেলা, সর্বোপরি সরকারের শিক্ষানীতির কোপে ইতিমধ্যেই সরকারি শিক্ষাব্যবস্থা ভেঙে পড়েছে। এর সুযোগে বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলো বিপুল ফি আদায় করে চলেছে। এর বিরুদ্ধে একাধিকবার অভিভাবকদের পক্ষ থেকে প্রতিবাদ জানানো হয়েছে। এআইডিএসও-র পক্ষ থেকেও বারবার এই বিষয়ে সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হলেও এই সমস্যার কোনও সমাধান হয়নি। সম্প্রতি হাইকোর্টের বিচারপতির কথাতেও সেই প্রসঙ্গ উঠে এসেছে।

তিনি বলেন, বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের যথেচ্ছ ফি আদায় রোধে সরকারের এই নিষ্ক্রিয়তা কোনও কাকতালীয় ঘটনা নয়, পরিকল্পিত। সরকারি শিক্ষানীতির ফলেই আজ সরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলি পরিকাঠামোহীন। যার ফলে পড়াশোনার পরিবেশ নষ্ট হয়েছে। ব্যাপকভাবে বাড়ছে ড্রপ আউট। ফলে ৮২০৭টি সরকারি স্কুল বন্ধ হয়ে গেছে। আরও কয়েক হাজার স্কুল বন্ধের মুখে। শিক্ষকের অভাব সহ নানা পরিকাঠামোগত সমস্যা, যে কোনও অজুহাতে সরকারি স্কুলের পঠন-পাঠন বন্ধ রাখা প্রভৃতি কারণে সচেতন অভিভাবকরা সরকারি স্কুল থেকে মুখ ফিরিয়ে নিতে বাধ্য হচ্ছে। সন্তানের শিক্ষার ভবিষ্যৎ সুনিশ্চিত করতে অভিভাবকরা সরকারি প্রতিষ্ঠান থেকে বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান মুখী হচ্ছে। এইভাবে সরকারের প্রচ্ছন্ন মদতে চলছে শিক্ষার বেসরকারিকরণ। তাই বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে লক্ষ লক্ষ টাকা ফি নিলেও সরকার নীরব থাকে শিক্ষা ব্যবসায়ীদের স্বার্থে। আমরা সরকারের এই ভূমিকার প্রতিবাদ জানাচ্ছি। আমরা মনে করি শিক্ষার অধিকার সার্বজনীন। তাই সরকারি উদ্যোগেই সবার শিক্ষাকে নিশ্চিত করতে হয়। কিন্তু কেন্দ্র বা রাজ্য সরকার বারবার তার সে দায়িত্বকে অস্বীকার করেছে।

আমরা সরকার ও শিক্ষা ব্যবসায়ীর এই অশুভ আঁতাতের প্রতিবাদে এবং সামগ্রিকভাবে সরকারি শিক্ষাব্যবস্থাকে রক্ষার জন্য ছাত্র শিক্ষক অভিভাবকদের প্রতিবাদ আন্দোলনে সামিল হওয়ার আহ্বান জানাচ্ছি।

প্রতাপগড়ে মিছিল ও জনসভা

একের পাতার পর

বাতিল সহ অন্যান্য দাবিতে উত্তরপ্রদেশে এস ইউ সি আই (সি)-র প্রতাপগড় জেলা কমিটির উদ্যোগে ১৫ ফেব্রুয়ারি পট্টিতে বিক্ষোভ মিছিল হয়। ব্যাপক সংখ্যায় ছাত্র-যুব-মহিলা-শ্রমিক-কৃষকের উপস্থিতিতে ব্যানার-পতাকায় সজ্জিত এই মিছিল শেষ হওয়ার পর বহেলিয়াপুরে দলের দফতরের সামনে জনসভা অনুষ্ঠিত হয়। সভাপতিত্ব করেন কমরেড বেচন আলি। বক্তব্য রাখেন দলের পূর্ব উত্তরপ্রদেশ সম্পাদক কমরেড রবিশঙ্কর মৌর্য, কমরেড জগন্নাথ বর্মা প্রমুখ।

বিজেপি সরকারের শ্রমিকবিরোধী নীতির বিরুদ্ধে
এআইইউটিইউসি-র দাবি দিবস পালিত

ক্রমবর্ধমান মূল্যবৃদ্ধি, বেকারি সহ নানা সমস্যায় জনজীবন জেরবার। এর উপর কেন্দ্রীয় সরকার ও নানা রাজ্যের সরকার শ্রমজীবী সাধারণ মানুষের ওপর একের পর এক আক্রমণ চালিয়ে যাচ্ছে। সীমিত অর্থেও গণতান্ত্রিক অধিকার সাধারণ মানুষের যা ছিল তাও তারা হরণ করে নিচ্ছে। কর্মসংস্থানের হাল দেখে বৃহৎ পুঁজি নিয়ন্ত্রিত সংবাদপত্রগুলিও পর্যন্ত বলতে বাধ্য হচ্ছে— সরকারকে কর্মসংস্থানের বন্দোবস্ত করতে হবে। অন্যথায় পুঁজিবাদী অর্থনীতিই ভেঙে পড়তে পারে।

বছরে দু'কোটি বেকারের চাকরি দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়ে কেন্দ্রে ক্ষমতাসীন মোদি সরকার সমস্ত সরকারি প্রতিষ্ঠানে কার্যত স্থায়ী নিয়োগ বন্ধ করে দিয়েছে। একের পর এক সরকারি প্রতিষ্ঠানকে জলের দরে মুনাফালোলুপ বেসরকারি মালিকদের হাতে বিক্রি করে দিচ্ছে। ব্যাহত হচ্ছে সরকারি পরিষেবা। ব্যাপক মূল্যবৃদ্ধি হচ্ছে শিক্ষা, স্বাস্থ্য, বিদ্যুৎ ও পরিবহণের এবং চাল, ডাল, ভোজ্যতেল, রান্নার গ্যাস, ওষুধ সহ নিত্যব্যবহার্য সমস্ত অত্যাবশ্যকীয় পণ্যের। বিগত দশ বছরে বৃহৎ কর্পোরেট হাউসগুলির প্রায় চোদ্দ লক্ষ কোটি টাকার অনাদায়ী ঋণ মকুব করে দেওয়া হয়েছে, যার দায়ভার এসে পড়েছে সাধারণ মানুষ ও শ্রমজীবী মানুষের ওপর।

কেন্দ্রে অধিষ্ঠিত বিজেপি সরকার কোনও আলোচনা ছাড়াই দেশের সমস্ত শ্রমনীতিগুলির বিলোপ সাধন করে চারটি শ্রম কোড চালু করার কথা ঘোষণা করেছে। ফলে এতদিন যতটুকু অর্থেও শ্রমিক-কর্মচারীরা শিল্প বিরোধ নিষ্পত্তি সংক্রান্ত আইনগত সুযোগ সুবিধা পেতেন, সেটুকুও এই স্বৈরাচারী সরকার কেড়ে নিতে চলেছে। বাস্তবে শিল্পক্ষেত্রে মালিকদের লাগামহীন সন্ত্রাস নামিয়ে আনারই নীল নকশা এই চারটি শ্রম কোড। শক্তিশালী শ্রমিক আন্দোলনের অনুপস্থিতির সুযোগ নিয়ে পুঁজিপতিদের স্বার্থরক্ষাকারী বিভিন্ন রাজ্য সরকার এই চারটি শ্রম কোড চালু করতে বদ্ধপরিকর। এর সাথে আট ঘন্টার পরিবর্তে চালু হতে চলেছে বারো ঘন্টার কর্মদিবস। এমনকি ইনফোসিসের কর্ণধার সপ্তাহে নব্বই ঘণ্টার কর্মদিবস চালু করার নিদান দিয়েছেন যা শিল্পপতি মহল অতি কৌশলে ভাসিয়ে দিয়েছে। কার্যকরী প্রতিরোধ গড়ে তুলতে না পারলে এই নব্বই ঘন্টার কর্মদিবস শুধু কথার কথা না থেকে বাধ্যতামূলক হয়ে যেতে পারে। এটাও আজ অজানা নয়, শ্রমিক-কর্মচারীদের অবসরকালীন পেনশন কেড়ে নিয়ে যে 'নয়া পেনশন নীতি' চালু করা হয়েছিল তার বিরুদ্ধে লাগাতার আন্দোলনের চাপে পড়ে কেন্দ্র সরকার শ্রমজীবী মানুষদের বিভ্রান্ত করার জন্য শ্রমিক বিরোধী 'ইউনিফায়েড পেনশন নীতি' চালু করেছে। কোনও কোনও শ্রমিক নেতা এই নীতির সাফাইও গাইছেন। কিন্তু সরকার কোনও ভাবেই পুরনো যে নিশ্চিত পেনশন প্রকল্প ছিল, তা ফেরাতে চাইছে না। পশ্চিমবঙ্গেও রাজ্য সরকার কেন্দ্রীয় হারে বকেয়া ডিএ সহ শিক্ষক-কর্মচারীদের বহু ন্যায্য দাবি মানছে না। কেন্দ্রে অষ্টম বেতন কমিশনের ঘোষণা হলেও রাজ্য সরকার এ ব্যাপারে কোনও মনোযোগ দিচ্ছে না।

১৯ ফেব্রুয়ারি এআইইউটিইউসি-র পক্ষ থেকে শ্রমিক স্বার্থবিরোধী কালা ৪টি শ্রমকোড বাতিল এবং কেন্দ্র ও রাজ্য বাজেটে মালিকদের স্বার্থে পদক্ষেপ নেওয়ার বিরুদ্ধে কলকাতায় আয়কর ভবনের সামনে বিক্ষোভ দেখানো হয় এবং বাজেটের প্রতিলিপি পোড়ানো হয়।

অগ্নিসংযোগ করেন সংগঠনের রাজ্য সম্পাদক অশোক দাস। তিনি বলেন, জনমত উপেক্ষা করে কেন্দ্রীয় সরকার শ্রমকোড চালু করার অপচেষ্টা করছে। এর বিরুদ্ধে সমস্ত শ্রমজীবী মানুষকে ঐক্যবদ্ধ শক্তিশালী আন্দোলন গড়ে তোলার আহ্বান জানান তিনি।

আশা, অঙ্গনওয়াড়ি, মিড ডে মিল সহ স্কিম ওয়ার্কারদের কোনও স্থায়ী বেতনকাঠামো নেই। তাদের সরকারি কর্মচারী হিসেবে বিবেচনা করার দাবি উপেক্ষিত। কর্ণাটকে আশা কর্মীদের ব্যাপক আন্দোলনের ফলে কর্ণাটক সরকার ন্যূনতম দশ হাজার টাকা বেতন, ইনক্রিমেন্ট ইত্যাদি দাবি মানতে বাধ্য হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গেও দাবি আদায়ে এ ধরনের আন্দোলন গড়ে তোলার আহ্বান জানান এআইইউটিইউসি নেতৃবৃন্দ।

মোটরভ্যান, টোটো, বাইক ট্যাক্সি চালকদের পরিবহণ শ্রমিক হিসেবে স্বীকৃতি ও লাইসেন্স পাওয়ার দাবি এখনও উপেক্ষিত। অথচ প্রায়শ মোটরভ্যান চালকদের উপরে চলে প্রশাসনিক হয়রানি বন্ধ করার বারবার আশ্বাস দেওয়া সত্ত্বেও পুলিশি জুলুম অব্যাহত চলছে। প্ল্যাটফর্ম ওয়ার্কার, গিগ ওয়ার্কার হিসাবে আজ লক্ষ লক্ষ শিক্ষিত বেকার কাজ করতে বাধ্য হচ্ছে, অথচ সরকার তাদের দাবির প্রতি কর্ণপাতই করছে না। নির্মাণ-বিড়ি-দর্জি-জরি-হোসিয়ারি-পরিযায়ী শ্রমিকদের সুরক্ষা ও নিরাপত্তা ভীষণভাবে অবহেলিত। উপরোক্ত দাবিগুলি সহ পঁচিশ দফা দাবিতে এআইইউটিইউসি ১১-১৭ ফেব্রুয়ারি দেশব্যাপী দাবি সপ্তাহ পালনের ডাক দেয়। এই কর্মসূচির অঙ্গ হিসেবে পশ্চিমবঙ্গের সমস্ত জেলায় নানা কারখানা, গঞ্জ-শহরে দাবি দিবসের কর্মসূচি হয়। সভা, বিক্ষোভ, রাস্তা অবরোধ ইত্যাদি নানা ভাবে কর্মসূচি পালিত হয়।

পাঠকের মতামত

মহাকুম্ভ ও যোগী সরকার

১৪৪ বছর পর গ্রহ নক্ষত্র যোগে প্রয়াগরাজের মহাকুম্ভ মেলা এখন মধ্যগগনে। উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগীজির সর্বাত্মক প্রচেষ্টায় দেশের প্রধানমন্ত্রী মোদিজির বদান্যতায় ও মেলা কমিটির অকৃপণ আয়োজনে রাজকোষের মাত্র ৭,৫৩৫ কোটি টাকার অধিক খরচ করিয়া মহাকুম্ভের নামে ধর্মান্ধতার অন্ধমোহে নিবিষ্ট করিতে দেশে 'হিন্দু জাগরণে'র ব্যবস্থাটি বেশ পাকাপোক্ত হইয়াছে। অথচ দুর্ভাগ্যের হইলেও ইহাই সত্য, কেন্দ্রীয় সরকার মাত্র ৫ কোটি টাকাও বিজ্ঞান চিন্তার প্রসারের লক্ষ্যে বিজ্ঞান কংগ্রেসের জন্য বরাদ্দ করিতে অপারগ। ফলে বিজ্ঞান কংগ্রেস বিগত দুই-তিন বছর যাবত বন্ধ হইয়া রহিয়াছে। সত্য সেলুকাস, বিচিত্র এই দেশ! মাস দুয়েক পূর্ব হইতে নবজাগরণ ও স্বাধীনতা আন্দোলনের পীঠস্থান পশ্চিমবাংলাতেও এ রাজ্যে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতিতে ফাটল ধরাইবার উদ্দেশ্যে সর্বত্রই বিরোধী দলনেতার উদ্যোগে 'বাংলার হিন্দু সমাজ এক হোক' বাণীতে বিদ্যাসাগর, রামমোহন, রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্রের বাংলা হইতেও কুম্ভযাত্রীর সংখ্যা নেহাত কম হয় নাই। ধর্মে বিশ্বাস বা অবিশ্বাস যে কোনও স্বাধীন দেশের প্রতিটি নাগরিকের একান্তই ব্যক্তিগত। এ ব্যাপারে সরাসরি হস্তক্ষেপ করা রাষ্ট্র, সরকার কিংবা কোনও রাজনৈতিক দলেরই উচিত নয়। এমনকি গণমাধ্যমগুলির পক্ষ হইতেও কোনও এক বা একাধিক ধর্মের প্রতি আকর্ষণ জাগানো সংবাদ প্রচার করা নীতিবিরুদ্ধ। অথচ স্বাধীনতার পর হইতেই আমাদের দেশে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের ঘৃণ্য পৃষ্ঠপোষকতায় দীর্ঘদিন ধরিয়া তাহা চলিতেছে। প্রকৃত বিজ্ঞানভিত্তিক শিক্ষার অভাবে, জীবনের নানা সমস্যায় জর্জরিত নিরুপায় মানুষ ভাগ্য ও কপাল তত্ত্বে ভর করিয়া পাপমুক্ত হইয়া অলীক পুণ্যলাভের আশায় হাজারে হাজারে মহাকুম্ভে পাড়ি দিতেছে।

আরও লক্ষণীয়, মহাকুম্ভ সন্নিহিত বিশাল এলাকা জুড়িয়া, বেশ কয়েক মাস পূর্ব হইতেই আমিষ আহার ভক্ষণ ও বিক্রি বর্জনীয় এবং সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের কোনও ব্যক্তিই মেলা প্রাঙ্গণে ব্যবসা করিতে পারিবে না বলিয়া হুলিয়া জারি করা হইয়াছে। ফলস্বরূপ দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আগত ভক্তদের পুণ্যস্নানের পর উদরপূর্তির জন্য খাবার খুঁজিতে খুবই কষ্ট স্বীকার করিতে হইয়াছে। উত্তরপ্রদেশের ও কেন্দ্রের সরকারের পরিকাঠামো ও পরিবহণের ব্যবস্থাপনা নিয়ে প্রচার, বাস্তবে বহুলাংশেই অসত্য। পুণ্যার্থীদের জন্য ব্যবস্থা আসলে প্রয়োজনের তুলনায় অতীব নগণ্য। ঘন্টায় পাঁচ হাজার টাকা ভাড়া দিয়া নাকি হোটেল এবং রিসর্টে ভক্তদের থাকতে বাধ্য করা হইয়াছে। ইতিমধ্যেই অস্থায়ী তাঁবুতে তিনটি জায়গায় আগুন লাগিয়া সব ভস্মীভূত হইয়া গিয়াছে। বিশেষ পুণ্যতিথিতে স্নানযাত্রার সময় অপরিকল্পিত উদ্যোগ ও ভিড়ের চাপে কয়েকশো মানুষের প্রাণহানি ঘটিয়াছে। তাহার সংখ্যা ও ক্ষতিপূরণের টানাটানি লইয়া যোগী সরকার ল্যাজেগোবরে। যদিও মেলা উদ্যোক্তাদের মতে মৃত ব্যক্তিদের স্বর্গপ্রাপ্তি হইয়াছে, যাহা নাকি খুবই মঙ্গলসূচক ও কল্যাণকর!

সমাজমাধ্যমে বেশ কয়েকদিন ধরিয়া নানা ট্রেনে ব্যাপক ভাঙচুরের ভিডিও দেখা গিয়েছে। সে ক্ষেত্রে মাথায় ফেট্টি বেঁধে, হাতে বড় বড় লোহার রড ও ইট নিয়ে মহিলাদের শাড়ি ধরে টানিতেও দেখা গিয়েছে ভক্তদের। ট্রেনের কামরাতে ঢুকিয়া সাধারণ যাত্রীদের হেনস্তা করা, জিনিসপত্র কাড়িয়া নেওয়া, মারধর করা যেন কুম্ভফেরত বিজয়ীদের অধিকারের মধ্যেই পড়ে! যদিও এই বিষয়ে রেলের মন্ত্রী-কর্তাব্যক্তিদের দেখভালের কোনও প্রশ্নই নাই। তাঁহারা চোখে ঠুলি পরিয়াছেন। প্রশ্ন উঠিতেছে, যাহারা ভারতীয় রেলের সম্পদ নষ্ট করিল, মহিলা-যাত্রীদের শ্লীলতাহানি করিল, সিসিটিভিতে সবকিছু ধরা পড়িলেও কেন তাহাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা লওয়া হইল না? সমাজমাধ্যমে ভাইরাল হওয়া সেই ছবি দেখিলে মনে হইবে না যে রেল পরিষেবা নামক ব্যবস্থাটি আদৌ আছে। খবরে প্রকাশ, গত ১৫ ফেব্রুয়ারি নয়াদিল্লি স্টেশনে রেলকর্তাদের ভুল ঘোষণায় প্ল্যাটফর্মে ট্রেন আসিবার গুজবে কেবল ভিড়ের চাপে ১৮ জনের মৃত্যু হইয়াছে।

যদিও কয়েক দিন পূর্বেই বিজ্ঞানভিত্তিক চিকিৎসা পদ্ধতিতে অবিশ্বাসী রামমন্দিরের প্রধান পূজক পুরোহিত বাঁচিবার শেষ আশ্রয়স্থল হিসাবে নামকরা হাসপাতালে চিকিৎসা লইয়াই 'পরলোকগমন' করিয়াছেন!

স্বপন জানা, মেছেদা

২১ ফেব্রুয়ারি ভাষা শহিদ দিবস উপলক্ষে কলকাতার হাজরা মোড়ে শহিদ বেদিতে মাল্যদান করছেন এআইডিএসও রাজ্য সম্পাদক কমরেড বিশ্বজিৎ রায়

এক দেশ এক ভোট

তিনের পাতার পর

এবং যে সর্বভারতীয় দল প্রচারে আর্থিক জোর এবং অন্যান্য আনুষঙ্গিক বিষয়ে এগিয়ে আছে, সেই দলই লাভবান হবে। এ ক্ষেত্রে বিজেপিই হল সেই দল। তাই একসঙ্গে ভোট করতে বিজেপির এত তৎপরতা। এ দেশে নির্বাচনের ক্ষেত্রে বহুদলীয় গণতন্ত্রের পরিবর্তে একচেটিয়া পুঁজির স্বার্থরক্ষাকারী দুটি দল বা দুটি জোটকে একদিকে আর্থিক অনুদান দিয়ে এবং অন্যদিকে এমনভাবে প্রচার মাধ্যমের সাহায্যে জনসাধারণের সামনে তুলে ধরা হচ্ছে, যার ফলে নির্বাচনের চূড়ান্ত মেরুকরণ ঘটছে। জনসাধারণের কাছে তৃতীয় কোনও বিকল্প থাকছে না। ধীরে ধীরে এই ব্যবস্থার দ্বারা এদেশের শাসক শ্রেণি এবং তাদের স্বার্থরক্ষাকারী এই দল বা জোট বিপ্লবী দল ও অন্যান্য ছোট দলগুলির নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার পথকেও বন্ধ করার চেষ্টা করবে।

একসময় সামন্ততন্ত্রের অবসানে শিল্পবিপ্লবের প্রথম যুগ, যাকে পুঁজিবাদের বিকাশের যুগ বলা হয়, সেই সময় অর্থনৈতিক ব্যবস্থার উপরিকাঠামো হিসেবে বহুদলীয় গণতন্ত্রের পরিবেশ গড়ে উঠেছিল। ধীরে ধীরে পুঁজিবাদের বিকাশ ঘটেছে এবং তারই একটা স্তরে এসে একচেটিয়া পুঁজির জন্ম হয়েছে। সাম্রাজ্যবাদের জন্ম হয়েছে। তার প্রতিফলন হিসাবে রাজনৈতিক কেন্দ্রীকরণ, গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানগুলির অধিকার খর্ব করার দ্বারা ফ্যাসিবাদের লক্ষণগুলি ক্রমাগত প্রকট হয়ে উঠছে। আমাদের দেশেও একইভাবে তার স্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে। আমাদের দল মহান মার্কসবাদী চিন্তানায়ক কমরেড শিবদাস ঘোষের শিক্ষার ভিত্তিতে পুঁজিবাদের বর্তমান ক্ষয়িষ্ণু ও মরণোন্মুখ যুগে ফ্যাসিবাদের এই লক্ষণগুলিকে বহু আগেই দেখিয়েছে। এরই ফলে দেশের মধ্যে বহুদলীয় গণতন্ত্রের উপর তারা আঘাত হানছে। ফলে, একত্রে নির্বাচন করার দ্বারা সেই সমস্ত পদক্ষেপগুলিকে আরও সুষ্ঠুভাবে বাস্তবায়িত করার চেষ্টা করছে বিজেপি এবং কেন্দ্রীয় সরকার। 'ডবল ইঞ্জিনে'র সরকার গড়বার স্লোগানও তারই পরিপূরক। কেন্দ্রে রাজ্যে একই দল বা জোটের সরকার হলে উন্নয়নের ধারা চলবে প্রবল গতিতে— এই প্রচারের দ্বারা জনমতকে বিভ্রান্ত করতে তারা উঠেপড়ে লেগেছে। আর যত প্রচার হচ্ছে তত দেখা যাচ্ছে ডবল ইঞ্জিনের তলায় পিষ্ট হচ্ছে আপামর জনসাধারণ। যদিও রাজ্যের ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত অন্য দলগুলিও পুরসভা বা পঞ্চায়েত নির্বাচনের সময় একই দলের সদস্যদের নির্বাচনে ভোট দেওয়ার কথা বলে। এ রাজ্যে অতীতে নির্বাচনে সিপিআইএম সেই প্রচারই করত। বর্তমানে তৃণমূল কংগ্রেসও সেই প্রক্রিয়াই গ্রহণ করছে। ফলে পুরো প্রচেষ্টাটাই এদেশের বুকে ফ্যাসিবাদকে পাকাপোক্ত করবার উদ্দেশ্য নিয়ে। সর্বহারার মহান নেতা কমরেড শিবদাস ঘোষ গভীর প্রজ্ঞায় দেখিয়েছেন, বর্তমান যুগে উন্নত বা অনুন্নত সকল পুঁজিবাদী দেশেই পুঁজিবাদ তার শাসন শোষণকে দীর্ঘায়িত করার জন্য, এমন কি সংসদীয় রাস্তা বজায় রেখেই ফ্যাসিবাদের পথ নেবে। ফ্যাসিবাদের সুস্পষ্ট তিনটি লক্ষণকে তিনি পরিষ্কার করে দেখিয়েছিলেন, একদিকে যেমন সে অর্থনীতির চূড়ান্ত কেন্দ্রীকরণ করে, অন্যদিকে প্রশাসনিক কেন্দ্রীকরণকে প্রতিষ্ঠা করার জন্য একের পর এক পদক্ষেপ নেয়। এরই পাশাপাশি ফ্যাসিবাদ, বিজ্ঞানের কারিগরি দিকের সাথে অধ্যাত্মবাদের সংমিশ্রণ ঘটিয়ে এবং অন্ধ ধর্মীয় গোঁড়ামির দ্বারা মানুষের মধ্যে বিজ্ঞানমনস্কতাকে ধ্বংস করে 'মানুষ' গড়ে তোলার প্রক্রিয়াতেই বাধার সৃষ্টি করে।

এক দেশ এক ভোট ফ্যাসিবাদের পথ প্রশস্ত করবে

ধর্মীয় অন্ধতাকে ভিত্তি করে 'এক দেশ'-এর স্লোগান তুলে দেশের সাধারণ মানুষের দেশের প্রতি ভাবাবেগকে কাজে লাগিয়ে ফ্যাসিবাদের পথকে সুদৃঢ় করতে বদ্ধপরিকর তারা। দীর্ঘদিন ধরেই চলছে এই প্রচেষ্টা। কংগ্রেস শাসনেও সেই প্রচেষ্টা ছিল। বিজেপি সেই প্রচেষ্টাকে ব্যাপক রূপ দিতে চলেছে। সঙ্গে 'এক দেশ এক নেতা'র স্লোগান। হিটলার-মুসোলিনির মতো সর্বশক্তিমান এক নেতার প্রতি মানুষের আবেগ ও বিশ্বাসকে কাজে লাগানোর প্রচেষ্টা ফ্যাসিবাদের আরেকটি লক্ষণ। একসময় ইন্দিরা গান্ধীকে 'এশিয়ার মুক্তিসূর্য' করে সেই প্রচেষ্টা হয়েছিল। শেষ পর্যন্ত তা বেশি দূর এগোয়নি। বর্তমানে বিজেপি নরেন্দ্র মোদিকে সামনে আনবার চেষ্টায় লিপ্ত। তাকে 'লার্জার দ্যান লাইফ' হিসেবে তুলে ধরার কৌশলও গ্রহণ করেছে বিজেপি। সেই উদ্দেশ্য থেকেই একদিকে দেশ জুড়ে উগ্র হিন্দুত্বের উন্মাদনা গড়ে তোলা, এক সংস্কৃতির নামে তাকে সম্ভব করার প্রচেষ্টা এবং ইতিহাসের বিকৃতি ঘটানো।

'এক দেশ এক ভোট' এই প্রচেষ্টা শুধুমাত্র একটা আইন বা বিধি নয়। এর পেছনে রয়েছে গভীর ষড়যন্ত্র। ফ্যাসিবাদকে পরিপূর্ণতায় পৌঁছে দেওয়ার ষড়যন্ত্র। দেশে যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোকে ধ্বংস করে দ্বিদলীয় ব্যবস্থার মাধ্যমে ফ্যাসিবাদকে প্রতিষ্ঠিত করবার এই চক্রান্ত বা কৌশলকে পরাস্ত করতে হবে। মার্ক্সবাদ-লেনিনবাদ-শিবদাস ঘোষের চিন্তাধারার ভিত্তিতে যথার্থ শ্রেণি দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে এই অপকৌশলের স্বরূপকে মানুষের সামনে উদঘাটিত করতে হবে। মানব সভ্যতার ঘৃণ্যশত্রু ফ্যাসিবাদকে দীর্ঘায়িত করার যে প্রচেষ্টা বিজেপি এবং কেন্দ্রীয় সরকার 'এক দেশ এক ভোট' স্লোগানের মাধ্যমে করতে চাইছে তাকে প্রতিহত করা সমস্ত শুভবুদ্ধিসম্পন্ন গণতান্ত্রিক মনোভাবাপন্ন মানুষের একটি অবশ্যপ্রয়োজনীয় দায়িত্ব।

জীবনাবসান

দলের দার্জিলিং জেলার ফুলবাড়ি লোকাল কমিটির দীর্ঘদিনের কর্মী কমরেড নির্মল বর্মন দীর্ঘ রোগভোগের পর ২০ জানুয়ারি শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। বয়স হয়েছিল ৫৯ বছর। তিনি লিভার সিরোসিস রোগে আক্রান্ত হয়েছিলেন। পেশায় ছিলেন একজন গ্রামীণ চিকিৎসক। তিনি এলাকায় সকলের কাছেই অত্যন্ত প্রিয় ছিলেন। এলাকার মানুষের বিপদে ঝাঁপিয়ে পড়তেন। কমরেড বর্মন পার্টির উন্নত নীতি-নৈতিকতার প্রতি আকর্ষণের ভিত্তিতে এলাকায় বহু আন্দোলন সংগঠিত করেছিলেন। গণকমিটি গঠন করে পঞ্চায়েত নির্বাচনে জয়ী হয়েছিলেন। তাঁর মৃত্যুতে দল একজন মূল্যবোধসম্পন্ন কর্মীকে হারাল।

কমরেড নির্মল বর্মনের মৃত্যুর দিন দলের দার্জিলিং জেলার প্রায় সমস্ত নেতা-কর্মীরা কলকাতায় মহামিছিলে যোগ দিতে ট্রেনে ছিলেন। তা সত্ত্বেও সংবাদ পাওয়ামাত্র নানা অসুবিধার কারণে যাঁরা কলকাতা যেতে পারেননি তাঁরা সকলে ছুটে যান ও শ্রদ্ধা জানান।

দলের ফুলবাড়ি লোকাল কমিটির উদ্যোগে ৯ ফেব্রুয়ারি ভুটকিতে স্মরণসভা অনুষ্ঠিত হয়। বক্তব্য রাখেন জেলা কমিটির সদস্য তন্ময় দত্ত, আবুল কাশেম, শোভা কার্জি, উদয় কুণ্ডু, হরিকিশোর রায়, পুত্র সুব্রত বর্মন প্রমুখ। সভাপতিত্ব করেন পূর্বতন লোকাল সম্পাদক ভগীন্দ্র নাথ রায়।

কমরেড নির্মল বর্মন লাল সেলাম

মোদির কোনও আপত্তিই শুনবেন না

একের পাতার পর

বইয়ে পড়া গ্রিক সম্রাট আলেকজান্ডারের কাছে পরাজিত সম্রাট পুরুর সেই বিখ্যাত উক্তি। পুরু তাঁর থেকে কেমন ব্যবহার আশা করেন, আলেকজান্ডারের এই প্রশ্নের উত্তরে পুরু বলেছিলেন— রাজার মতো ব্যবহার। বিজেপি নেতারা কথায় কথায় প্রাচীন ইতিহাস তুলে ধরেন। অথচ ট্রাম্প যখন ভারতীয় পণ্যে পাল্টা শুল্ক চাপানোর ঘোষণা করে বললেন, 'আমি (মোদির) কোনও তর্ক শুনব না', তখন মোদি এ কথা ট্রাম্পকে শোনাতে পারলেন না যে, আমিও একটি স্বাধীন, সার্বভৌম রাষ্ট্রের প্রধান। তাই আপনার ব্যবহার তেমনই হওয়া উচিত। পরিবর্তে ভারতের একচেটিয়া মালিকদের স্বার্থের উমেদারি করতে গিয়ে দেশের প্রধানমন্ত্রী হাত কচলালেন।

মোদির সঙ্গে বৈঠকের ঘণ্টাখানেক আগেই ট্রাম্প তাঁর পাল্টা শুল্ক নীতি ঘোষণা করে বলেছিলেন, 'আমেরিকার বন্ধুরা অনেক সময় শত্রুদের থেকেও খারাপ'। যা শুনে কারও সন্দেহ ছিল না যে, তাঁর লক্ষ্য ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ছাড়া কেউ নন। তখনই স্পষ্ট হয়ে যায় যে বৈঠকে কী ঘটতে চলেছে। শুধু তাই নয়, বাস্তবে ট্রাম্প মোদিকে কেমন বন্ধু মনে করেন তা-ও বুঝিয়ে দেন— প্রথমে ১০৪ জনকে, পরে দফায় দফায় ভারতীয় অভিবাসীদের হাতে-পায়ে শিকল পরিয়ে যাত্রীবাহী বিমানের পরিবর্তে সেনা বিমানে পশুর মতো ফেরত পাঠিয়ে।

ভারতীয় পণ্যে বিপুল শুল্ক

মোদির সফরের ঠিক আগে আমেরিকা সে দেশে ভারত থেকে আমদানি করা ইস্পাত ও অ্যালুমিনিয়ামের উপর ২৫ শতাংশ শুল্ক বসানোর কথা ঘোষণা করে। এর ফলে ভারত থেকে ১০০ কোটি ডলারের রফতানি সংকটের মুখে পড়বে। অন্য দিকে মোদি সরকার এমন একটা সম্ভাবনা বুঝে আগেই বাজেটে ২০টি মার্কিন পণ্যে থাকা চড়া শুল্ক প্রত্যাহার করে নেয়। মোট ২৮টি মার্কিন পণ্যে চড়া শুল্কের ৮টির চড়া শুল্ক তারও আগে প্রত্যাহার করা হয়েছিল। আমেরিকা উঁচু হারে শুল্ক চাপালে শুধু ইস্পাত কিংবা অ্যালুমিনিয়ামই নয়, ভারতের ওষুধ ও চিকিৎসা সরঞ্জাম, তথ্যপ্রযুক্তি রফতানিও ব্যাপক ভাবে মার খাবে। ইরানের চাবাহার বন্দর নিয়ে যে ছাড় এতদিন ভারত ভোগ করছিল তা প্রত্যাহার করে নেওয়ার সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেছেন ট্রাম্প। অথচ এই বন্দরে ভারতের কয়েক লক্ষ কোটি টাকা বিনিয়োগ করা রয়েছে।

বিপুল অঙ্কের অস্ত্র ও তেল-গ্যাস কিনতে বাধ্য করল আমেরিকা

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে পাশে বসিয়ে ডোনাল্ড ট্রাম্প ঘোষণা করলেন, ২০২৫ থেকে আমেরিকা ভারতকে কোটি কোটি ডলারের সমরাস্ত্র এবং এফ-৩৫ যুদ্ধ বিমান বিক্রি করবে। এবং যুদ্ধাস্ত্র বিক্রির এই পরিমাণ ক্রমেই বাড়তে থাকবে। সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য, বহু কোটি দামের এই এফ-৩৫ বিক্রির কথা ঘোষণার আগে ভারতের সঙ্গে কথা বলারও প্রয়োজন মনে করেনি আমেরিকা। অর্থাৎ একতরফা ভাবেই মার্কিন যুদ্ধবিমান নির্মাতা লকহিড কোম্পানির বিমান ভারতকে গছিয়ে দেওয়া হল। আর ছাপান্ন ইঞ্চি ছাতির 'মহা শক্তিমান' নরেন্দ্র মোদি নীরবে ট্রাম্পের বিপুল পরিমাণ অস্ত্র রফতানি আবদার মেনে এলেন। এখানেও শেষ নয়।

মোদিকে পাশে রেখেই ট্রাম্প ঘোষণা করেছেন, ভারতকে আমেরিকা থেকে বিপুল পরিমাণ তেল এবং গ্যাস কিনতে হবে। কারণ, আমেরিকা দু'দেশের বাণিজ্যিক ঘাটতি কমিয়ে আনতে চায়। অবশ্য এই ঘোষণাটি যুদ্ধ বিমান বিক্রির মতো এক তরফা নয়। ট্রাম্প বলেছেন, আমেরিকাই যে ভারতে সব থেকে বেশি পরিমাণে তেল এবং গ্যাস জোগান দেবে সে ব্যাপারে তাঁদের ঐক্যমত্য হয়েছে। তেল আমদানির পরিমাণ বার্ষিক ১৫ বিলিয়ন ডলার থেকে বাড়িয়ে ২৫ বিলিয়ন ডলার করা হবে।

ভারত ও আমেরিকার মধ্যে গত বছর বাণিজ্যের পরিমাণ ছিল ১২,৯২০ কোটি ডলার। ভারত আমেরিকায় রফতানি করেছে ৮,৭৪০ কোটি ডলারের পণ্য। আমেরিকা থেকে এ দেশে আমদানি হয়েছে ৪,১৮০ কোটি ডলারের পণ্য। ট্রাম্প ঘোষণা করেছেন ২০৩০-এর মধ্যে উভয় দেশের বাণিজ্যের পরিমাণ ৫০ হাজার কোটি ডলারে পৌঁছবে। এই বিপুল অঙ্কের বাণিজ্যে আমেরিকা যদি ভারতে সমপরিমাণ পণ্য রফতানি করে তবে ভারতীয় বাজার যে মার্কিন পণ্যে ছেয়ে যাবে তা বলার অপেক্ষা রাখে না।

ট্রাম্পের চাপের কাছে নতি স্বীকার মোদির

স্বাভাবিক ভাবেই দেশ জুড়ে সাধারণ মানুষের মধ্যে প্রশ্ন উঠছে যে, এখনও পর্যন্ত সবচেয়ে বেশি টাকা খরচ করে আমেরিকা থেকে এই বিপুল পরিমাণ অস্ত্র কি ভারতের নিরাপত্তার জন্য সত্যিই দরকার ছিল? যে দেশ বিশ্ব ক্ষুধা সূচকে ১২৫টি দেশের মধ্যে ১১১তে স্থান পায়, যে দেশের বিরাট এলাকায় পানীয় জলের জন্য পরিবারের মহিলাদের এখনও মাইলের পর মাইল হাঁটতে হয়, সুপেয় পানীয় জলের অভাবে হাজার হাজার মানুষ প্রতি বছর আমাশয়ে ভোগে, হেপাটাইটিস-বিতে মারা যায়, যে দেশের লোকাল ট্রেনগুলিতে প্রতি দিন কোটি কোটি মানুষ পশুর মতো যাতায়াত করে, যে দেশের ৫০ শতাংশ প্রসূতি মা অপুষ্টিতে ভোগেন, শিশুদের বড় অংশ কম উচ্চতা এবং কম ওজন নিয়ে বেড়ে ওঠে, যে দেশে করোনা অতিমারি দেখিয়ে দেয় হাসপাতালগুলিতে বেডের সংখ্যা এক হাজার দেশবাসী পিছু ১.৩, সে দেশে কার নিরাপত্তার কথা ভেবে এই বিরাট সমরায়োজন চালাচ্ছেন নরেন্দ্র মোদিরা? বুঝতে অসুবিধা হয় না, দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ সাধারণ মানুষের করের টাকা খরচ করে এই বিরাট অস্ত্রসম্ভার কেনার উদ্দেশ্য আসলে মার্কিন যুদ্ধ অর্থনীতিকে চাঙ্গা রাখার মার্কিন প্রচেষ্টার কাছে নতি স্বীকার ছাড়া আর কিছু নয়। ভারত সরকারের বৈদেশিক বাণিজ্যে সব চেয়ে বেশি মার্কিন নির্ভরতাও এ কাজে ভারতকে বাধ্য করেছে।

তা ছাড়া যুদ্ধে ইজরায়েল এবং ইউক্রেনকে ভারত যে বিপুল পরিমাণ অস্ত্র রফতানি করেছে তা মার্কিন অনুমতি সাপেক্ষেই। বিজেপি সরকার দেশীয় পুঁজিপতিদের এই স্বার্থের কথা মাথায় রেখেই প্যালেস্টাইনের স্বাধীনতার দাবিকে সমর্থনের দীর্ঘদিনের ভারতীয় ঐতিহ্যকে লঙ্ঘন করে প্যালেস্টাইন প্রশ্নে আমেরিকা-বন্ধু ইজরায়েলের পাশে দাঁড়িয়েছে।

রাশিয়ার সস্তা তেল নয়, আমেরিকার দামি তেলই কিনতে হবে

তেল আমদানিতে যতই মোদি-ট্রাম্প ঐক্যমত্য হোক, তা ভারতীয় জনগণের ঘাড়ে বিরাট মূল্যবৃদ্ধিকে চাপিয়ে দেবে। ভারতকে তার প্রয়োজনের ৮৫ শতাংশ তেল বিদেশ থেকে আমদানি করতে হয়। ইউক্রেন যুদ্ধের আগে পর্যন্ত এর বেশির ভাগটাই আসত ইরাক এবং সৌদি আরব থেকে। রাশিয়া থেকে আমদানি করত মাত্র ০.২ শতাংশ। ২০২২ এর ফেব্রুয়ারিতে ইউক্রেন যুদ্ধ শুরু হওয়ার পর আমেরিকা ইউরোপের দেশগুলিতে রাশিয়ার তেল কেনায় নিষেধাজ্ঞা জারি করলে রাশিয়া ভারতকে আন্তর্জাতিক বাজারের থেকে অনেক কম দামে তেল বিক্রির প্রস্তাব দেয়। আন্তর্জাতিক বাজারে তেলের দাম ব্যারেল পিছু ১৪০ ডলারে পৌঁছে গেলেও রাশিয়া ভারতীয় কোম্পানিগুলিকে মাত্র ৪০ ডলারে, এমনকি তার থেকেও কম দামে তেল দিতে রাজি হয়। বর্তমানে ভারতের প্রয়োজনীয় তেলের ৫০ শতাংশের বেশি আমদানি হয় রাশিয়ার সস্তা তেল। সেখানে মার্কিন তেল আমদানির অংশ ২০১৯-এর ৪.৫ শতাংশ থেকে কমে ২০২৪-এ দাঁড়িয়েছে ৩.৪ শতাংশ। স্বাভাবিক ভাবেই ট্রাম্পের ফতোয়া মানতে গেলে রাশিয়ার সস্তা তেল বাদ দিয়ে আমেরিকার দামি তেলই এখন থেকে ভারতকে নিতে হবে। ভারত থেকে আমেরিকার দীর্ঘ দূরত্বের পরিবহন খরচ মিটিয়ে দেশের বাজারে তেল হয়ে উঠবে অনেক দামি। তাতে মার্কিন তেল কোম্পানিগুলির বিপুল মুনাফা হবে। কিন্তু তার বোঝা বইতে হবে ভারতের সাধারণ মানুষকেই।

পরমাণু দুর্ঘটনায় মার্কিন কোম্পানিগুলির দায় থাকল না

মার্কিন চাপের কাছে নতি স্বীকার করে ভারত পরমাণু বিদ্যুৎ ক্ষেত্রে দুর্ঘটনার দায়বদ্ধতা সংক্রান্ত আইন শিথিল করতে চলেছে। ট্রাম্প ঘোষণা করেছেন, এর ফলে আমেরিকার সংস্থাগুলি ভারতকে পরমাণু বিদ্যুৎ চুল্লি জোগান দিতে পারবে। এখানেও প্রশ্ন উঠছে যে, মোদি সরকার দুর্ঘটনার দায়বদ্ধতা আইন শিথিল করছে কার স্বার্থ রক্ষা করতে? নিশ্চয় ভারতীয় জনগণের স্বার্থ রক্ষা করতে নয়। কোনও পরমাণু বিদ্যুৎ চুল্লিতে দুর্ঘটনা ঘটলে মার্কিন কোম্পানিগুলি এ বার তার দায় ঝেড়ে ফেলতে পারবে।

দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কে তর্কটুকুও সইবে না আমেরিকা

ট্রাম্পের সঙ্গে মোদির বন্ধুত্ব নিয়ে বিজেপি মহল কম ঢাক-ঢোল বাজায়নি। তাঁদের ভাবটা ছিল এমন যেন, পরিস্থিতি যত কঠিনই হোক না কেন, মোদি আছেন মানে ভারতের স্বার্থ ঠিক ছিনিয়ে আনবেনই। 'মোদি হ্যায় তো মুমকিন হ্যায়।' এ বারও ভারত-মার্কিন বৈঠকের সাফল্য প্রমাণ করতে সরকারের ধামাধরা প্রচারমাধ্যম ব্যাপক প্রচার চালিয়েছে। কিন্তু তার দ্বারা এ সত্য কোনও ভাবেই চাপা দেওয়া যাচ্ছে না যে, ট্রাম্প যা করতে চেয়েছিলেন সে কাজে তিনি পুরোপুরি সফল। বৈঠকের পরে মোদির উল্লেখ করেই ট্রাম্প ঘোষণা করেছেন, 'আপনারা যে হারে শুল্ক চাপাবেন, আমিও সেই হারে চাপাব। এ ব্যাপারে আমার সঙ্গে কেউ তর্ক করতে পারবেন না।' পুঁজিবাদী রাষ্ট্রনায়কদের কাছে পুঁজিপতি শ্রেণির স্বার্থের থেকে কোনও ব্যক্তিগত বন্ধুত্বই যে বেশি দামি নয়, মোদিভক্তরা তা যত দ্রুত বুঝবেন ততই দেশের মঙ্গল। বাস্তবে বিজেপি-বাহিনী প্রচার চালিয়ে মোদিকে 'অতিমানব' হিসাবে তুলে ধরলেও এবং ভোটের রাজনীতিতে তার থেকে ফয়দা তোলা গেলেও বাস্তবে যে তিনি তা নন, তাঁর মুখের উপর ট্রাম্পের এত বড় কথাতেই স্পষ্ট হয়ে গেল এবং এটাও স্পষ্ট হয়ে গেল যে আমেরিকার তুলনায় ভারত কোথায় দাঁড়িয়ে আছে। অন্য দিকে তা এটাও দেখিয়ে দিয়েছে যে, মার্কিন অর্থনীতি বিশ্বে সবচেয়ে শক্তিশালী হলেও তা-ও আজ গভীর সঙ্কটে আচ্ছন্ন। সেই সংকট থেকে দেশকে বের করে আনার প্রতিশ্রুতি দিয়েই তিনি মানুষের সমর্থন আদায় করেছেন এবং দ্বিতীয় বারের জন্য ক্ষমতায় বসেছেন। ভারতীয় পণ্যে শুল্ক অন্যান্য শর্ত চাপানোর ঘটনা তাই কোনও ভারত-বিদ্বেষ থেকে নয়, এটা ট্রাম্পের বাধ্যতা। তাই শুধু ভারত নয়, ইউরোপ এবং সব রাষ্ট্রের উপরও একই রকম শুল্ক এবং শর্ত চাপানো ঘোষণা করেছেন।

ভারতীয় অভিবাসীদের অমর্যাদার প্রতিবাদ করলেন না প্রধানমন্ত্রী

ভারতীয় অভিবাসীদের দফায় দফায় হাতে-পায়ে শিকল বেঁধে যুদ্ধ বিমানে ফেরত পাঠানোর কোনও প্রতিবাদ কেন প্রধানমন্ত্রী করলেন না— এ প্রশ্নও দেশজুড়ে মানুষের মনে প্রবল আলোড়ন তুলেছে। এই অভিবাসীরা কেউ দাগী অপরাধী নন। তা হলে তাঁদের সম্মানের সঙ্গে এ দেশে ফেরত পাঠানো হল না কেন? অভিবাসী বলেই কি তাঁদের জানোয়ারের মতো এ ভাবে বেঁধে ফেরত পাঠানো যায়? তা হলে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি বৈঠকে কার প্রতিনিধিত্ব করলেন? যদি তিনি ভারতীয় জনগণেরই প্রতিনিধিত্ব করে থাকেন তবে তো তাঁদের মর্যাদা রক্ষা করাটা ছিল তাঁর কর্তব্য। তিনি সেই মর্যাদা রক্ষা করেননি শুধু নয়, গোটা বিশ্বের সামনে ভারতীয় জনগণের মর্যাদাকে ধুলোয় মিশিয়ে দিয়েছেন। প্রতিবাদ করার পরিবর্তে মোদি ট্রাম্পের সুরেই সুর মিলিয়ে বলছেন, অন্য দেশে বেআইনি ভাবে থাকার কারও অধিকার নেই। আর এর দায় তিনি সম্পূর্ণরূপে আন্তর্জাতিক মানব পাচার চক্রের উপর চাপিয়ে দিয়ে নিজে দায় এড়িয়েছেন। বিদেশমন্ত্রী জয়শঙ্কর বলেছেন, এটি কোনও নতুন ঘটনা নয়। অর্থাৎ তিনি এর মধ্যে মার্কিন প্রশাসনের দোষের কিছু দেখতে পাননি। অথচ কে না জানে, মোদির ভারত যদি যুব সমাজের যোগ্য কাজ তৈরি করতে পারত, যদি ভদ্র ভাবে বাঁচার মতো ব্যবস্থাটুকু করে দিতে পারত তবে দেশ ছেড়ে এমন বিপদসঙ্কুল রাস্তায় এত কষ্ট, এত অনিশ্চয়তা মধ্যে দিয়ে লক্ষ লক্ষ টাকা ধার করে, সম্পত্তি বেচে দালালদের খপ্পরে পড়ে তাঁরা কেউ বিদেশে পাড়ি দিতেন না। দালালরাও এ সুযোগ নিতে পারত না। প্রধানমন্ত্রী অনায়াসে এ কথা ট্রাম্পকে বলতে পারতেন যে এই অভিবাসীরা

আটের পাতায় দেখুন

R.N.I. No 5268 / 1960
P.R. No. KOL RMS/138/2025-27

গণদাবী GANADABI Volume: 77, No.: 29 Bengali Weekly February 28, 2025 Kolkata Price: Rs. 3.00

ন্যায়বিচার, গণতান্ত্রিক কাঠামো ও মানবাধিকার রক্ষার দাবিতে

লিগাল সার্ভিস সেন্টারের রাজ্য সম্মেলন

ন্যায়বিচার নিশ্চিত করা, গণতান্ত্রিক কাঠামো ও মানবাধিকার রক্ষা সহ আইনজীবী-ল-ক্লার্ক-ডিড রাইটারদের ১১ দফা দাবিতে আন্দোলন গড়ে তোলার আহ্বান জানিয়ে অনুষ্ঠিত হল লিগাল সার্ভিস সেন্টারের চতুর্থ রাজ্য সম্মেলন। কলকাতার মৌলালী যুবকেন্দ্রে ২২ ফেব্রুয়ারি প্রকাশ্য অধিবেশনে পাঁচশতাধিক মানুষ অংশ নেন। বক্তব্য রাখেন কলকাতা হাইকোর্টের বর্তমান প্রধান বিচারপতি টিএস শিবজ্ঞানম, কলকাতা ও বোম্বে হাইকোর্টের প্রাক্তন প্রধান বিচারপতি চিত্ততোষ মুখার্জী, সুপ্রিম কোর্টের প্রাক্তন বিচারপতি অশোক কুমার গাঙ্গুলী, প্রাক্তন বিচারপতি শ্যামল কুমার সেন। এ ছাড়াও বক্তব্য রাখেন, কলকাতা হাইকোর্টের প্রাক্তন বিচারপতি শৈলেন্দ্রপ্রসাদ তালুকদার, প্রাক্তন অ্যাডিশনাল ডিস্ট্রিক্ট ও সেশনস জাজ অনন্ত কুমার বর্ধন, কলকাতা হাইকোর্টের সিনিয়র আইনজীবী পার্থসারথী সেনগুপ্ত, শিবপ্রসাদ মুখার্জী। উপস্থিত ছিলেন পাটনা হাইকোর্টের অ্যাডভোকেট গোপালকৃষ্ণ, জামশেদপুর আদালতের চন্দনা ব্যানার্জী প্রমুখ।

সংগঠনের সম্পাদক প্রবীণ আইনজীবী ভবেশ গাঙ্গুলী সমস্ত অতিথিদের হাতে স্মারক ও উপহার তুলে দেন। ২৩ ফেব্রুয়ারি প্রতিনিধি অধিবেশনে কলকাতা হাইকোর্ট সহ রাজ্যের অধিকাংশ আদালত থেকে আগত তিনশতাধিক প্রতিনিধি নতুন ন্যায় সংহিতা সহ আইনের কাঠামো পরিবর্তন এবং আইনজীবী-ল ক্লার্ক, ডিড রাইটারদের সমস্যা সমাধানে আন্দোলনের বিষয়ে আলোচনা করেন। দেশের বর্তমান সংকটগ্রস্ত পরিস্থিতি সমাধানে আন্দোলনে এগিয়ে আসার জন্য প্রতিনিধিদের কাছে আহ্বান জানিয়ে বক্তব্য রাখেন প্রাক্তন বিচারক অনন্ত বর্ধন ও সংগঠনের সংগঠক রূপম চৌধুরী। সম্মেলন থেকে চিত্ততোষ মুখার্জীকে প্রধান উপদেষ্টা, প্রাক্তন বিচারপতি এসপি তালুকদারকে সভাপতি ও আইনজীবী কার্তিক কুমার রায়কে সম্পাদক করে ৭৭ জনের রাজ্য কমিটি নির্বাচিত হয়।

মোদির কোনও আপত্তিই শুনবেন না

সাতের পাতার পর

মার্কিন অর্থনীতিতে কম ভূমিকা পালন করেনি। সেখানকার নির্মাণশিল্পে, কৃষিতে, রেস্তোরাঁগুলিতে ভারত সহ বিভিন্ন দেশের এই অভিবাসীদের মার্কিন ব্যবসায়ীরা সস্তা শ্রমিক হিসাবেই ব্যবহার করে। তাই তাদের সাথে মানুষের মতো ব্যবহারটুকু ছিল মার্কিন প্রশাসনের কর্তব্য। পুঁজিপতি শ্রেণির সেবা করতে করতে প্রধানমন্ত্রী কি ভুলেই গেছেন যে, দেশের সাধারণ মানুষের মর্যাদা রক্ষা করাটাও প্রধানমন্ত্রী হিসাবে তাঁর দায়িত্ব?

কলম্বিয়া মেক্সিকো যা পারে তা কেন পারে না ভারত?

এ প্রসঙ্গে আরও একটি ঘটনা উল্লেখ করা দরকার— কলম্বিয়া ভারতের থেকে অনেক ছোট দেশ হওয়া সত্ত্বেও সে দেশের নাগরিকদের সঙ্গে মার্কিন প্রশাসনের এমন ধরনের অন্যায় আচরণকে মেনে নেননি শুধু নয়, এমন আচরণের তীব্র প্রতিবাদ করে মার্কিন বিমান ফেরত পাঠিয়ে নিজেদের দেশের বিমান পাঠিয়ে অভিবাসীদের ফেরত এনেছেন এবং প্রেসিডেন্ট স্বয়ং বিমানবন্দরে গিয়ে তাঁদের অভ্যর্থনা জানিয়েছেন। উল্লেখ্য, কলম্বিয়ার প্রেসিডেন্ট কখনও তাঁর ছাতির মাপ জনসমক্ষে প্রচার করেননি।

এর পরও নরেন্দ্র মোদি বলেছেন, 'ভারত আমেরিকার সম্পর্ক গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের উপর ভর করে রয়েছে।' বাস্তবে চুক্তির মধ্যে কোথাও গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের চিহ্নমাত্র নেই। সর্বত্রই রয়েছে শক্তিশালী পুঁজির দাপট। গোটা চুক্তি থেকে স্পষ্ট, মোদি ট্রাম্পের সঙ্গে সমানে সমানে বৈঠক করেননি, করেছেন সাম্রাজ্যবাদী শিবিরের জুনিয়র পার্টনার হিসাবে। মোদি যতই ৫ ট্রিলিয়ন ডলারের অর্থনীতির গর্ব করুন, তা মার্কিন অর্থনীতির থেকে এখনও বহু দূরে। ট্রাম্পের কাছে কোনও একটি দেশ গণতান্ত্রিক না অগণতান্ত্রিক সেটা বিষয়ই নয়, আসলে সে দেশ শক্তিশালী কি না। তাই যত অগণতান্ত্রিকই হোক পুতিনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতাতে তাঁর কোথাও আটকায়নি।

আসলে একটা দেশের অর্থনীতি কত বড় সেটা বড় কথা নয়, দেশের মর্যাদা রক্ষা করতে গেলে, একটা দেশকে নেতৃত্ব দিতে গেলে রাষ্ট্রনেতার যে আত্মমর্যাদাবোধ থাকা দরকার তা যে নরেন্দ্র মোদির মতো বিজেপি নেতার যে নেই, তা এই ঘটনায় স্পষ্ট। মেক্সিকো ভারতের থেকে অনেক দুর্বল অর্থনীতির দেশ। তা সত্ত্বেও ট্রাম্পের পাল্টা শুল্ক চাপানোর ঘটনা মোদির মতো তাঁরা নীরবে হজম করেনি, প্রতিবাদ করেছে, মার্কিন পণ্যের উপর পাল্টা শুল্ক ঘোষণা করেছে। মোদি সরকার তা পারেনি। কলম্বিয়া, মেক্সিকো পেরেছে, কারণ, সেখানকার জনগণের মধ্যে যে সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী মানসিকতা রয়েছে তাই সেখানকার রাষ্ট্রপ্রধানদের বাধ্য করেছে প্রতিবাদ করতে। ভারতে বিজেপি, কংগ্রেসের মতো দলগুলোর একচেটিয়া পুঁজির তোষণের রাজনীতির কারণে এ দেশের সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী ঐতিহ্য আজ অনেকটাই মলিন। তাই মোদি যেমন ভারতীয় জনগণের এই অমর্যাদার প্রতিবাদ করেননি, তেমনই ট্রাম্পও ভারতের জনগণের প্রতি কোনও মর্যাদা দেখানোর কোনও চেষ্টা করেননি।

বাংলাদেশে বিরাট কৃষক কনভেনশন

কৃষকের ফসলের লাভজনক দাম নিশ্চিত করা, সার-বীজ, কীটনাশক সহ সকল কৃষি উপকরণের দাম কমানো, খেতমজুরদের সারা বছরের কাজের নিশ্চয়তা, ভূমিহীনদের পুনর্বাসন, রাষ্ট্রীয় সার কারখানা চালু, কালোবাজারি রোধ, আর্মি-পুলিশের রেটে রেশন সহ ১৯ দফা সংস্কারের প্রস্তাব নিয়ে ২৩ ফেব্রুয়ারি বাংলাদেশের রংপুরে টাউন হল মাঠে বাংলাদেশ খেতমজুর ও কৃষক সংগঠনের কনভেনশন অনুষ্ঠিত হয়। সংগঠনের কেন্দ্রীয় আহ্বায়ক আহসানুল আরেফিন তিতুর সভাপতিত্বে এবং সাধারণ সম্পাদক অজিত দাসের সঞ্চালনায় কনভেনশনে বক্তব্য রাখেন ভাষা সৈনিক মোঃ আফজাল, বাসদ (মার্ক্সবাদী) কেন্দ্রীয় নির্বাহী ফোরামের সমন্বয়ক মাসুদ রানা, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক মোশাহিদা সুলতানা ঋতু, বাংলাদেশ নারীমুক্তি কেন্দ্রের সাধারণ সম্পাদক নিলুফার ইয়াসমিন শিল্পী, বাংলাদেশ খেতমজুর ও কৃষক সংগঠনের রংপুর জেলার আহ্বায়ক আনোয়ার হোসেন বাবলু, গাইবান্ধা জেলার সভাপতি আহসানুল হাবীব সাঈদ, কিশোরগঞ্জ জেলার সংগঠক আলাল মিয়া, নীলফামারী জেলার নেতা রফিকুল ইসলাম, ময়মনসিংহ জেলার সংগঠক আব্দুর রাজ্জাক, আলুচাষি সাইফুল ইসলাম, আখচাষি রবিউল ইসলাম সহ সারা দেশ থেকে আগত কৃষক নেতৃবৃন্দ।

নেতৃবৃন্দ বলেন, ২০২৪-এর গণঅভ্যুত্থানে হাজারো ছাত্র-জনতার আত্মদান ও রক্তের বিনিময়ে আবারও বৈষম্যহীন গণতান্ত্রিক বাংলাদেশ নির্মাণের আকাঙ্ক্ষা তৈরি হয়েছে। সবচেয়ে বেশি শোষণ-বৈষম্যের শিকার কৃষক-খেতমজুরদের আশা আকাঙ্ক্ষাকে বাস্তবায়িত না করে বৈষম্যহীন দেশ নির্মাণ সম্ভব নয়। অবিলম্বে অন্তর্বর্তী সরকারকে কৃষি সংশ্লিষ্ট সবার মতামতের ভিত্তিতে কৃষকের স্বার্থের পরিপূরক কৃষি ক্ষেত্রে সংস্কারের উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। কৃষি উপকরণ ও ফসলের বাজার নিয়ন্ত্রণ করে কিছু দেশি-বিদেশি ব্যবসায়ী ও কোম্পানির সিন্ডিকেট এবং মধ্যস্বত্বভোগী ব্যবসায়ীরা। স্বাধীনতা পরবর্তী সমস্ত সরকার এই সব পুঁজিপতি গোষ্ঠীর স্বার্থে কৃষি সংক্রান্ত নানা বিধিবিধান তৈরি করেছে। ফলে দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ কৃষক-খেতমজুর-ভূমিহীন গরিব মানুষ সবসময় শোষিত ও বঞ্চিত হয়ে আসছে। এর বিরুদ্ধে তাঁরা কৃষক-খেতমজুরদের অধিকার আদায়ে ইস্পাতদৃঢ় সংগঠন ও আন্দোলন গড়ে তোলার আহ্বান জানান।

দিল্লিতে আশাকর্মীদের ধরনা

এআইইউটিইউসি-র ডাকা সারা ভারত প্রতিবাদ দিবস উপলক্ষে ১৭ ফেব্রুয়ারি দিল্লি আশা ওয়ার্কার্স অ্যাসোসিয়েশনের ডাকে উপরাজ্যপাল ভবনের সামনে প্রতিবাদ ধরনা অনুষ্ঠিত হয়। বক্তব্য রাখেন এআইইউটিইউসি নেতা এ এস নেগি, এম চৌরাসিয়া প্রমুখ।

Editor : Amitava Chatterjee ■ Published by Amitava Chatterjee on behalf of SUCI (C), West Bengal State Committee from 48 Lenin Sarani, Kolkata 13 ■ Printed by Soumen Basu at: Ganadabi Printers and Publishers Pvt. Ltd. 52B Indian Mirror Street, Kolkata-13 ■ Phone: 9433451998, 9432889347 ■ E-mail: ganadabi@gmail.com ■ Web: https://ganadabi.com